তৃতীয় সংখ্যা
আগষ্ট ১৯৯১
শ্রাবণ ১৩৯৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

Sullah
13/8/91

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সম্পাদনা—পরিষদঃ

মুহম্মদ আব্দুস সালাম
আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া
ডঃ মোহাম্মদ তারেক
সৈয়দ নকীব মুসলীম
কংকা জামিল খান

সম্পাদকঃ

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

সহযোগী সম্পাদকঃ

মোঃ ইমামুল হক

তৃতীয় সংখ্যা আগষ্ট ১৯৯১ শ্রাবণ ১৩৯৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৩য়সংখ্যা
আগষ্ট ১৯৯১, শ্রাবণ ১৩৯৮

সূচীপত্র

গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান ৫
ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশে ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ১৩
মোহাম্মদ সফিউর রহমান

প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো ৩৭
ডঃ মোহাম্মদ তারেক

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন ঃ
প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৪৭
নাসিরউদ্দীন আহমেদ

জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত ৫৫
এস, এম, আলী আব্বাস

বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবহণ খাতের ভূমিকা ঃ
একটি আলোচনা ৬৫
হেলাল উদ্দিন আহমেদ

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন ৭৩
গৌর সুন্দর বনিক

গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান

ডঃ মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান

অনেকদিন এক ব্যক্তির শাসনের ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে কেউ কেউ বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে এক ব্যক্তি শাসনের পতনের পর গণতন্ত্র উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মোটামুটিভাবে অবাধ নির্বাচনে সব দলই তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পেরেছেন। সেই সব বক্তব্য বিচার করে সাধারণ ভোটার তাঁদের ভোট দিয়েছেন। একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। সংসদে খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছে। দু' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারী পক্ষ বিরোধীদলগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। এসব দেখে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা সাধারণ মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্র একটি মূল্যবোধ যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র–সর্বস্তরে প্রযোজ্য না হলে এটি কেতাবী বুদ্ধি হিসেবেই থেকে যায়। এর বাস্তবায়ন ও পরিচর্য্যা একটি জীবনব্যাপী সাধনা। বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও এর ব্যবহার সীমিত অথবা অনুপস্থিত। তথাপি একে যত্নের সঙ্গে লালন করতে হবে এই আশায় যে এর অনুশীলন পরিণামে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য কল্যাণকর হবে। Democracy is never complete, it ever grows into being –এ, ডি, লিন্ডসের কথাটি এখানে স্মর্তব্য। [১]

আমলাতন্ত্র হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তাদের শাসন যা নীতিগতভাবে গণতান্ত্রিক শক্তির অনুগত কিন্তু কার্যত স্বাধীন। অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ–মন্ত্রী, সংসদ সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান ও সদস্যগণ নিজেদের কাজ কারবারে, দলীয় রাজনীতিতে ও অন্যান্যভাবে এত ব্যস্ত থাকেন যে দৈনন্দিন প্রশাসনের খুটি নাটি তাঁরা বুঝতে পারেন না, অথবা বুঝতে চাননা, অথবা সময় দিতে পারেন না। এর ফলে প্রশাসন আমলাতন্ত্রের হাতে এসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে জার্মান পন্ডিত ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, "In a modern state,

the actual ruler is necessarily and unavoidably the bureaucracy ...."। [২] এবং bureaucracy is a phenomenon with which the exponents of theories of representative government must learn to come to terms. বৃটিশ গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তিনধরনের বক্তব্য উপস্থিত হয়েছে– (১) গণতন্ত্রের নির্দেশে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে কোন সমস্যাই হয় না; (২) আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে গণতন্ত্রের তেমন কিছুই করার নাই অর্থাৎ গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রকে মানিয়ে চলবে; এবং (৩) সামজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র কোন সমস্যা নয়। বৃটিশ লেখক সি পি স্নো'র মতে, "The permanent bureaucracy channels the currents that temporary political masters buck at their peril"[৩] গাই পিটার্স (৪) আরো একটু এগিয়ে গেলেন, "Not only are agencies marked by "the ability of the permanent staff essentially to determine the agenda for their presumed political masters". রালফ হিউমেল উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে আমলাতন্ত্র ও সামাজিক লক্ষ্য কিভাবে পরস্পর বিরোধী। (৫) এক কথায়, পছন্দ করুন বা না করুন, আধুনিক প্রশাসন গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে কার্যতঃ মুক্ত। ঘন ঘন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সামরিক শাসন ও নানা অজুহাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমুহের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ফলে জাতীয়,আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন সত্যিকার অর্থে আমলাতন্ত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে গত দু'শতাব্দী ধরে। গণতান্ত্রিক সরকার অথবা সামরিক সরকার–সকল আমলেই সরকারী ক্ষমতা কার্যকর ভাবে আমলাতন্ত্রের কাছেই থেকে যায়।

দু' একটি উদাহরণ দেয়া যায়। সংবিধানের ১৩৩ ধারা মতে–"এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, তবে শর্ত থাকে যে, এ উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমুহ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে অনুরূপ বিধানসমুহ কার্যকর হইবে" [৬]– বিধানটিতে আমলাতন্ত্রের উপর মৌলিক ক্ষমতা সংসদের হাতেই রয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত সংসদ এ সম্পর্কে কোন আইন রচনা করিতে পারেন নাই। ফলে এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পিত হয়েছে। ১৩৪ ধারা মতে, "এই বিধানের দ্বারা অনুরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।" লক্ষণীয় আজ প্রায় বিশ বৎসরের মধ্যে সংসদ এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি যেহেতু নিজে সব কিছু করতে পারেন না,আমলাতন্ত্রই কার্যতঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহার করেন, ফলে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রই কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক, না সংসদ, না রাষ্ট্রপতি, না মন্ত্রী, কেহই আমলাতন্ত্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রক নন। ফলে আমলাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণহীন। সংবিধান সংসদকে এব্যাপারে সর্বক্ষমতা ন্যস্ত করা সত্বেও সংসদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ তেমন নেননি। কালাইয়ের ভাষায় Democracy-if it knows its ways-has nothing

to fear from bureaucracy"[৭,৮,৯] কথাটি বাংলাদেশের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ভেবে দেখতে পারেন।

সংবিধানের ১২৭ ধারা মতে বাংলাদেশের একজন মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক রয়েছেন। তাঁর দায়িত্ব "তিনি প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান করিবেন"। ১৩২ ধারামতে " প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টসমুহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন"। মহাহিসাব নিরীক্ষক উক্ত রিপোর্ট পেশ করার পর রাষ্ট্রপতি সংসদে পাঠান। এখন সংসদের দায়িত্ব এই রিপোর্টে উল্লেখিত ত্রুটিবিচ্যুতি আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় সংসদে ১৯৭৪ সালে প্রথম সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি মাত্র ৩টি বৈঠকে মিলিত হন এবং সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করতে পারেন নাই।[১০] চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত সরকারী হিসাব কমিটি মন্তব্য করেন যে পুর্ববর্তী কমিটি সমুহের অনেক সুপারিশ সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ লওয়ার জন্য অডিট বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মনত্রণালয় সমুহে উপর্যুপরি তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ লওয়া হয় নাই। [১০] অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই রিপোর্ট যথাযথ কার্যকর হয়না। যতটুকু হয় তার অনুসরণ হয় কি না এবং অপরাধী কর্মকর্তার শাস্তি হয় কি না-জনসাধারণ তা জানতে পারেন না। ফলে আমলাতন্ত্র মোটামুটি স্বাধীনই থেকে যাচ্ছে।

৭৬ (১) ধারামতে "সংসদ সদস্যের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ সরকারী হিসাব কমিটি নিয়োগ করিবেন"। সরকারী হিসাব কমিটি সরকারী ব্যয় বরাদ্দের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া আছে কিন্তু এই সব ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় কি? মাননীয় সংসদ সদস্যগণই কমিটির সদস্য হিসাবে "সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ ঘোষণা ও দলিলপত্র" পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখেন। সদস্যগণ কি এই সব ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহার করেছেন? করে থাকলে সরকারী হিসাব কমিটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর কার্যকর ক্ষমতা খাটাতে পারেন। সরকারী হিসাব কমিটির কার্য্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ নিয়মিত ও যথাসময়ে প্রকাশিত হয় না। ফলে জনগণ জানেন না সংসদ বা সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত সরকারী হিসাব কমিটি কতটুকু কার্যকরী ভুমিকা পালন করছেন।

সংসদে বাজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব নিয়ে যত বির্তক করেন বা সমালোচনার ঝড় তোলেন, তার দশভাগের একভাগও সরকারী অর্থের ব্যয় কিভাবে হোল, কারা ব্যর্থতার জন্য দায়ী, আগামীতে কি করা উচিত এসব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে বিতর্ক করেন না। ৭৭ ধারামতে সংসদ "আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার বিধান দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত এটি করা হয় নাই। অথচ জনগণের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ও প্রশাসনিক অনিয়মের সুবিচারের জন্যই এপদের প্রতিষ্ঠা। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কিছু

কাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারেন নাই। এরপর কোন প্রেসিডেন্ট এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। ফলে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মকর্তা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে সংসদে উপস্থিত হওয়ার কথা ৭৭(৩)। অথচ সংসদ এব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান কার্যকর থাকলে হয়ত অনেক অনিয়ম বা প্রশাসনিক অবস্থার দরুন সাধারণ মানুষের হয়রানি হোত না। এ ব্যাপারে সংসদের কি কোনই ভুমিকা থাকবে না?

১৪১ (১) ধারামতে–"সরকারী কর্মকমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পুর্বে পুর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসর স্বীয় কার্যবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন" এবং ১৪১ (৩) ধারামতে "যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও ১৪১ (২) ধারামতে স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন"। এই ক্ষমতা সংসদ যথাযথভাবে ব্যবহার করলে সরকারী কর্ম কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত হয় নাই এবং গৃহীত না হওয়ার কারণ এবং "যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত সরকারের পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ" সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত হতে পারেন এবং তার মাধ্যমে এই সব ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকান্ডকে সংসদ অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, সংবিধানে যে সমস্ত রক্ষাকবচ আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি উদাসীন। সংসদ যে ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণকে আমলাতান্ত্রিক হয়রানি থেকে রক্ষা করতে পারেন সেই সব সাংবিধানিক ক্ষমতা সংসদ পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করেন নাই অথবা করতে আগ্রহী নন। সংসদ.তার অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে যত যত্নবান হবেন, গণতন্ত্র তত দানা বাঁধবে।

আমাদের যে সীমিত সুযোগ সংবিধান দিয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার আমরা করছি না কেন? আইন করার সুযোগ আছে, আমরা আইন করছি না কেন?

প্রথম দিকে গণতন্ত্রকে একটি মুল্যবোধ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। গণতন্ত্র একটি জীবন ব্যবস্থা। অর্থাৎ পরিবারে, স্কুলে, অফিসে এককথায় সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ সক্রিয় থাকতে হবে। তা না হলে হঠাৎ করে গণতন্ত্র সংসদে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে না। একটি উদাহরণ দেই। এবারের সংসদীয় নির্বাচনে দল নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি প্রার্থী এভাবে ভোট চেয়েছেনঃ–

(ক) "খালেদা জিয়ার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন"।
(খ) "শেখ হাসিনার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন"।
(গ) "এরশাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন"।

অথচ বলা উচিত ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের, আওয়ামী লীগের, জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন। অর্থাৎ আমাদের মনে ব্যক্তি দলের চেয়ে বড় বলে স্থান করে নিয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এধরনের মানসিকতা বিপদজনক। প্রায় একইভাবে আমলাতন্ত্র প্রেসিডেন্টকে খুশী করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। গভর্ণর জেনারেল জিন্নার প্রতি, প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের প্রতি, প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের প্রতি, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি ও প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রতি এদেশের আমলাতন্ত্র এমন অনুগত্য দেখিয়েছেন যে দেশে আর কেউ আছেন বা আর কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁদের কোন দায় দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না। যে কোন বড় অফিসারের অফিসে ঢুকেই প্রথমে চোখে প্রেসিডেন্টের একটি ছবি। এই সব ছবি প্রতীকী হিসাবে একনায়কত্বকে উৎসাহ দেয়, অফিসারের কর্মতৎপরতার জন্য ছবির কি প্রয়োজন?

আর একটি উদাহরণ দিই। ৫৬(১) ধারামতে, "প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহা অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে"। খুব সম্ভবত এই ধারামতেই রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের প্রধান। তিনি নিজে প্রশাসন পরিচালনা করবেন অথবা তাঁহার অধিনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। যেহেতু রাষ্ট্রপতি নিজে সরাসরি সবকিছু পরিচালনা করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে পরিচালনা করেন আমলাতন্ত্র। সংবিধানের ৫৬(১) ধারামতে আমলাতন্ত্র শুধু রাষ্ট্রপতির "অধীনস্থ", মন্ত্রী বা সংসদের অধীন নন। মন্ত্রী এখানে মুখ্য ভুমিকায় আসেন না। প্রেসিডেন্টগণও একদিকে এ ধরনের ব্যবস্থাই বেশী পছন্দ করেন, অন্যদিক দাবী করেন, "উপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে চলতে পারে না", ইত্যাদি। ফলে গণতন্ত্র অর্থাৎ আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁদের কাজের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য-এ ব্যবস্থা দৃঢ়মুল হতে পারছেনা। ঘন ঘন সামরিক শাসনের ফলে প্রেসিডেন্ট ও উঁচু আমলাদের দ্বারাই যুগ্মভাবে দেশ শাসিত হয়েছে, সামরিক শাসনের অবসানেও এর জের থাকে যাচ্ছে।

এদায় দায়িত্ব কারো একার নয়। জনগণ, সরকার, প্রশাসন বিশেষ করে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। তাঁদের কাজে ও ব্যবহারে তাঁরা গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পারেন। প্রশাসনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। এখন যে প্রশাসক সম্মানিত পরে সেই প্রশাসকই ধিকৃত ও অবনমিত। এক আমলে যে প্রশাসক খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, অন্য আমলে তাকে ক্ষমতাহীন করে বিনা কাজে অর্থাৎ অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ও এস্ডি) করে রাখা হচ্ছে। অথচ বলা হচ্ছে না তাঁর কি অপরাধ? এক আমলে যিনি সকলের সমালোচনা করেছেন, অন্য আমলে তিনি নেতা। সরকারী কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় কি করে প্রকাশ্যে সরকারের কাজের সমালোচনা করতে পারেন, তাও বোধগম্য নয়। সরকারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এবং আচরন বিধি ১৯৭৯ অনুযায়ী তিনি এ ধরনের কাজ করতে পারেন না। একাজ করতে হলে তাঁকে চাকুরী ছেড়ে রাজনীতি করতে হয়। কখনও বিধিসম্মতভাবে সরকার এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করেন, কখনও আবার নমনীয় হন। এসব কর্মকান্ডের ফলে শৃঙ্খলাবোধ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সীমিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখতে পাই, সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা সংসদের আছে, অথচ তার যথাযথ ব্যবহার নেই। এতে সংবিধানের মুল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও লালনকল্পে বেশ কয়েকটি রক্ষাকবচ আমাদের সংবিধান দিয়েছে যার দ্বারা গণতন্ত্রের বিকাশ, গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের লালন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির নিশ্চয়তা বিধান হতে পারে। এখন, প্রয়োজন সংবিধানের যথাযথ ব্যবহার। এ ব্যাপারে সংসদের ভুমিকাই মুখ্য বলে আমার মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের লালন ঠিকমত হলে আমলাতন্ত্র যথাযথ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমলাতন্ত্রের কোন কার্যকর বিকল্প আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে সকলদেশেই আমলাতন্ত্র কমবেশী আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সংবিধানিকভাবে যথাযথ ব্যবহৃত হলে চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রশাসনিক তত্ত্ববিদগণের কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। র্জামান পন্ডিত ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, গণতন্ত্রকে কিছুটা হার মানতে হবে আমলাতন্ত্রের কাছে–কারণ আমলাতন্ত্র সুদক্ষ আর গণতন্ত্র অদক্ষ। কথাটি আপাতঃ সত্য, তবুও আমার মনে হয়, গণতন্ত্র দক্ষতা অর্জন করতে পারে, যদি গণতন্ত্র সাংবিধানিকভাবে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ও দায়িত্ব সম্পর্ক সর্তক হয়। তা না হলে গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সম্বন্ধে সক্রেটিস ও প্লেটো যে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন[১১], তাই সত্যি হয়ে দেখা দিতে পারে।

পাদটীকা ও তথ্য সংকেত

১। A. D. Lindsay. The Essentials of Democracy. Oxford: Clarendon, 1929.
The Modern Democratic State. New York: Oxford University Press, 1962.

২। M. Albrow. & Bureaucracy. London: Pall Mall, 1990.
Max Weber. The Theory of Social and Economic Organization. A. M Henderson and Talcott Parsons 1947; From Max Weber. Essays in Sociology. H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford, 1962, Economy and Society.

৩। C. P. Snow. Corridors of Power; Science and Government Harvard Universihy Press, 1960.

৪। Guy Peters. The Politics of Bureaucracy: A Comparative Perspective. 1978

৫। Ralph Hummel. The Bureaucratic Expericnce. New York: St. Martins Press. 1987.

৬। গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশেরসংবিধান (১৯৮৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত)

৭। Michael J. Hill. The Sociology of Public Administration. London: Weidenfelds Nicholson, 1972.
Anthony Downs. Inside Bureaucracy. Boston: Little Brown, 1967.

৮। M. A. Mutalib. Democracy, Bureaucracy and Technocracy. New Delhi: Concept Publishing Co. 1980.

৯। Peter Self. Administrative Theory and Politics. R. White and R. Lippitt. Autocracy and Democracy. New York: Harper & Row, 1960.

১০। বাংলাদেশজাতীয়সংসদ। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন। ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

১১। প্রেটোররিপাবলিক। সরদার ফজলুল করিম অনুদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

বিঃ দ্রঃ ৭নং পাদটীকায় কার্লাইলের বক্তব্যটি মূলতঃ বৃটিশ গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য। বৃটিশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র সম্পর্কে তার এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্যঃ 'I can see no risk or possibility in England. Democracy is hot enough here. দেখুন Albrow, Bureaucracy (Lonoan: Pall Mall, 1990), পৃঃ ২১। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি বেশ কয়েক যুগ চালু হওয়ার পরেই শুধু কার্লাইল কথিত 'গণতন্ত্রের উষ্ণতা'র আশা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
গবেষণা কর্মের তালিকা

১৯৮৬–৮৭ অর্থবছর

১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মজীবন উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে সমীক্ষা
২. সরকারী কর্মকর্তাদের কার্য সম্পাদন সমীক্ষা
৩. উপজেলা প্রশাসনের কতিপয় দিকঃ প্রশিক্ষণ
৪. সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিরাজিত সমন্বয় সমস্যা সমীক্ষা
৫. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতিপয় দিক
৬. বাংলাদেশ সির্ভিল সার্ভিসে মহিলা
৭. উপজেলা প্রশাসনের কতিপয় দিকঃ সমন্বয়
৮. প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উপর ঘটনা সমীক্ষা

১৯৮৭–৮৮ অর্থবছর

১. A Case Study of the Procedures for Adjudication of Grievances of Government Employees.
২. সরকারী দপ্তর সমূহের পরিদর্শন ও অনুসৃত পদ্ধতির নিরীক্ষা
৩. A Study of Constraints and Potentials in Domestic Resources Mobilization.
৪. Education in Bangladesh: A Case Study of Policy Planning in Primary Eduction.
৫. Assessment of Training Needs of Senior Civil Servants.
৬. Assessment of Training Needs of Mid-Level Officers.
৭. বুনিয়াদী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ
৮. ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণঃ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা

বাংলাদেশে ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন

মোহাম্মদ সফিউর রহমান

১. সারাংশ

ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি যে কোনা দেশের আইন ও প্রশাসনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশের আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি মালিকানা, ভূমি হস্তান্তর, ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি দখল ইত্যাদি নিয়ে এদেশে অহরহই মামলা মোকাদ্দমা ও দাংগা হাংগামা হয়ে থাকে। ভূমি সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধি সে জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহনকরে।

বাংলাদেশের ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার গোড়া পত্তন প্রধানতঃ বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে হয়। তবুও মোগল আমলের ভূমি আইন ও ভূমি বন্দোবস্ত নীতি বৃটিশ ভূমি প্রশাসনকে প্রভাবান্বিত করে। বাদশাহী লাখেরাজ রেগুলেশন এবং অবাদশাহী লাখেরাজ রেগুলেশন এর মধ্যে অন্যতম। তবে এর ওপর ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কেবলমাত্র প্রশাসনিক প্রভাবই ছিল না বরং এর ফলে সমাজের উপরও সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে। ১৯৫০ সনের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়নি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভূমি সংস্কারমূলক বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ভূমি রাজস্ব মওকুফ, জমি বন্টণ, জমি পুরুদ্ধার, হাট বাজারের ইজারাদারী ইত্যাদি ছাড়াও গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনা এর মধ্যে অন্যতম। ১৯৮২ সনের ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ থেকে শুরু করে ১৯৯১ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত দুটি সংশোধনী অধ্যাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ। বিভিন্ন আইনে বর্গা

চাষীদের জমি ও ফসলের উপর অধিকার, ক্ষেত মজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণ, চর এলাকার বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ভূমির উৎপাদনশীলতা আশানুরূপ বাড়ছেনা। ভূমি–আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে হতেই থাকবে, কিন্তু বিভিন্ন আইনে সাধারণ মানুষ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, ভূমির উৎপাদনশীলতা কতটুকু বাড়ছে, ভূমিহীন ও স্বল্পবিত্ত কৃষকের কতটুকু অবস্থার উন্নতি হচ্ছে সেটাই বিবেচ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রধানতঃ ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনার বিবর্তনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, তবে এর সামাজিক প্রভাব সম্পর্কেও কিছুটা ইংগিত দেয়াহয়েছে।

২. ভূমিকা

ভূমি মালিকানা, ভূমি হস্তান্তর, ভূমি দখল ইত্যাদি শুধু বাংলাদেশে এবং বর্তমান কালেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের আইন ও প্রশাসনে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি সমধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এদেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ডের অধিকাংশ প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভূমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই হয়ে থাকে। ভূমি আইনের বিবর্তন তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এদেশের ভূমি আইন ও ভূমি প্রশাসনের গোড়াপত্তন হয় মোগল আমলে। তৎপূর্বেও যে ভূমি কর, ভূমি বন্দোবস্ত ইত্যাদির প্রাধ্যান্য ছিলনা এমন নয়। মোগল বাদশা হুমায়ন যে চারটি ' সরে–কার' বা বা কর্ম বিভাগ সৃষ্টি করেন তন্মধ্যে সরে–কার–ই–খাক ভূমি বিভাগই প্রধান ছিল।[১] জরীপের ব্যপারটি প্রধানতঃ হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান বাদশা শের শাহ্ এর অবদান। মোগল বাদ্শা আকবরের মন্ত্রী টোডর মলের ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ প্রজ্ঞা ছিল। তাঁর পরামর্শে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে সুবা, জেলা, পরগণা, মৌজা ইত্যাদিতেবিভক্ত করেন।

বাদশাহী আমলের ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থাপনা পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে বাদ্শাহী লাখেরাজ রেগুলেশন এবং অবাদ্শাহী লাখেরাজ লেগুলেশনে বিভক্ত হয়। লাখেরাজ অর্থ নিষ্কর। লাখেরাজ বলতে দু'প্রকারের নিষ্কর ভূমি বুঝাত– বাদ্শাহী লাখেরাজ এবং অবাদ্শাহী লাখেরাজ। অবাদ্শাহী লাখেরাজ বিষয়ক আইনটি ১৭৯৩ সনের ১৯ নম্বর রেগুলেশন এবং বাদ্শাহী লাখেরাজ বিষয়টি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩৭ নম্বর রেগুলেশনে বিধিবদ্ধ হয়। বাদ্শাহী লাখেরাজ রেগুলেশন আল– তামাগা, আয়মা, মাদাদমাশ, নাজারাত, সায়ুরঘাল ও জায়গীর–এ ছয় প্রকৃতির ছিল।

১· 'সরেকার' শব্দটি ফারসী, যার অর্থ কাজের খাত বা কর্মবিভাগ। বাদ্শা হুমায়ুন প্রশাসনিক সুবিধার্থে চারটি কর্মবিভাগ সৃষ্টি করেন, যথা 'সরে–কার–ই–খাক' বা ভূমি বিভাগ, 'সরে–কার–ই–আব/বা পানি বিভাগ, 'সরে–কার–ই–আতশ' অর্থাৎ 'অগ্নি বিভাগ' (যুদ্ধ বিগ্রহ বিভাগ) এবং 'সরে–কার–ই–হাওয়া' অর্থাৎ আবহাওয়া বিভাগ। এই 'সরেকার' শব্দ থেকেই 'সরকার' শব্দটির উৎপত্তি।

'তামাগা' শব্দটির অর্থ সীলমোহর। লাল সীলমোহরযুক্ত উক্ত ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী আকারে একটি রাজকীয় অনুমোদনকে বুঝাত। এটা এমন একটা রাজকীয় দানপত্র ছিল যা গ্রহীতা এবং তদীয় উত্তরাধিকারীর জন্য একটা হস্তান্তরযোগ্য নিষ্কর জোত বা জমা বিশেষরূপে পরিগণিতছিল।

'আয়মা' বলতে এমন একটা নিষ্কর ভূমি বুঝাত যা মুসলিম ধর্ম শাস্ত্রে সুপন্ডিত অথবা বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে বা ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হতো। বিহার অঞ্চলের দিকেই এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল। কারো কারোর মতে জংগল পরিষ্কার বা উন্নয়মূলক কাজের জন্য সামান্য কর বা খাজনার বিনিময়ে ভূমি প্রদানকে আয়মা বলা হতো।

'মাদাদ্‌মাশা' বলতে ভরণ পোষণের উদ্দেশ্যে সাহায্য করা বুঝায়। সুপন্ডিত ব্যক্তিবর্গকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এধরনের বন্দোবস্ত প্রদান করা হতো। 'নাজারাত' বলতে মস্‌জিদ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে অনুদান এবং 'সায়ুরগাল' বলতে পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ফকির দরবেশ যারা পার্থিব জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করেছে তাদের জন্য অনুদান বুঝাতো।

জায়গীর বলতে অধিকৃত জায়গা বা ভু–সম্পত্তিকে বুঝনো হতো।[২] জায়গীর প্রথা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল– শর্তযুক্ত জায়গীর ও শর্তহীন জায়গীর। শর্তযুক্ত জায়গীর বাদশা বা সম্রাটের সামরিক বা বেসামরিক বিভাগীয় প্রধান বা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে প্রদান করা হতো। এরূপ জায়গীর বা দানপত্র ততদিন বলবৎ থাকতো যতদিন উক্ত কর্মকর্তা সে বিশেষ দপ্তরে দায়িত্বে থাকতেন। শর্তহীন জায়গীর বলতে কোন দপ্তরের সাথে সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র স্বাধীন দান বিশেষকে বুঝাতো। একে ব্যক্তিগত দানপত্র বলে গণ্য করা হতো।

অবাদ্‌শাহী লাখেরাজ অনুদানকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ করা হয়। যথা,

১। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের পুর্বে অনুমোদিত বা প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

২। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট থেকে শুরু করে ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত বা অনুমোদিত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি।

৩। ১৭৯০ সালে ১লা ডিসেম্বর থেকে প্রদত্ত বা অনুমোদিত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি।

উক্ত রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক রাখেরাজ বা নিষ্কর বা সরকারী রাজস্ব যুক্ত সম্পত্তি দখলকারী অথবা উক্ত অধিকারের দাবীদারের প্রকৃত স্বত্বের বৈধতা পরীক্ষা করে দেখা হয়। অনুরূপ ভাবে স্বত্বভোগকারীর প্রতি আরোপিত বার্ষিক জমা বা রাজস্ব সংগতভাবে নিরূপণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২. জায়গীর শব্দটি ফারসী 'জাহ' অর্থাৎ জায়গা এবং 'গীর' অর্থাৎ অধিকারী থেকে উৎপন্ন।

৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৯ সালে স্থানীয় দেওয়ানদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা তদারকের জন্য ইউরোপীয় সুপারভাইজারদেরকে নিয়োগ করেন। এ ইউরোপীয় সুপারভাইজারই পরবর্তী সময়ে কালেক্টর, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টার ও পরবর্তীতে ডিপুটি কমিশনাররূপে পরিচিত। ১৭৭২ সালে বৃটিশ সরকার ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব আদায় নিয়মিত করণ এবং এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কৃষকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হলে কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল একসনা বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এর ফলে অনেক প্রতিষ্ঠিত জমিদার উচ্ছেদকৃত হন এবং কৃষির উন্নতি বিধানেও জমিদার বা কৃষক অনুপ্রাণিত হননি।

উচ্ছেদকৃত জমিদাররা বৃটিশ কমন্স সভায় এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। এর ফলে ১৭৮৪ সালে পিটস্ এর ভারত শাসন আইন পাশ হয় যার আওতায় উচ্ছেদকৃত জমিদারদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার আদেশ দেয়া হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস জমিদার বা ভূ–স্বামীদের জন্য পরীক্ষা–মুলকভাবে একটি ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা সুপারিশ করেন এবং এ ব্যবস্থা সফল হলে স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হবে বলে বলা হয়।

১৭৯৩ সালের ১লা মে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বেংগল রেগুলেশন নং ১ বিধিবদ্ধ করেন। এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। এ আইনের বিধান মতে উক্ত সনের ২২ শে মার্চ থেকে জমিদাররা নিম্নোক্ত সুবিধাদি লাভ করেনঃ–

(১) নির্দিষ্ট সরকারী রাজস্ব সাপেক্ষে জমিদারদেরকে ভূমির একচ্ছত্র মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়।

(২) জমিদারদের উক্ত স্বত্ব বংশানুক্রমিক এবং হস্তান্তরের যোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

(৩) জমিদাররা তাদের এলাকায় অবিস্থিত সকল ভূমির খাজনা আদায়, খনিজ সম্পদ আহরণ, মৎস্য শিকার এবং অন্যান্য অশরীরী অধিকার জনিত বিষয়ের মালিকানা লাভ করেন।

(৪) জমিদাররা সাময়িক খাজনা বা রাজস্ব বৃদ্ধির আওতা থেকে রেহাই প্রাপ্ত হন।

(৫) জমিদারদেরক কতিপয় বিশেষ বিধিনিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছামত শর্তে তাদের অধীনস্থ প্রজা বা রায়তদের কাছে ভূমি বন্দোবস্ত বা ইজারা দেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়।

(৬) জমিদারদেরকে জলকর (মাছ ধরা সম্পর্কিত), বনকর (কাষ্ঠ সংগ্রহের অধিকার সম্পর্কিত), ফলকর (ফল সংগ্রহের অধিকার সম্পর্কিত) এবং খাস্‌কর (গো–চারণের অধিকার সম্পর্কিত) প্রভৃতি ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(৭) ভূমি মালিকদের তাদের স্ব স্ব ভূ–সম্পত্তির উন্নতি বিধানের দায়িত্ব ও অধিকার প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত বিধান মোতাবেক জমিদারেরা তাদের সমুদয় সম্পত্তি বা অংশবিশেষ দান, উপঢৌকন,বিক্রয় বা অন্য যে কোন প্রকার আইন সংগত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করতে পারতেন। তবে উক্ত আইনে সরকারের হাতে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ সংরক্ষিত থাকে–

(১) সপরিষদ গভর্নর জেনারেল, অধীনস্থ তালুকদার রায়ত এবং অপরাপর ভূমি চাষীর স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনবোধে কোন বিধি বিধান করার ক্ষমতা রাখেন।

(২) জমিদার বা ভূ–স্বামীদের থানা বা পুলিশ বাহিনী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এবং পুলিশী ভাতা সামগ্রিক বা আংশিক পুনঃ প্রচলনের অধিকার বা ক্ষমতা সরকারের হাতে রক্ষিত হয়।

(৩) স্থায়ী খাজনা নিরূপণের অধিকার সরকারের হাতে রক্ষিত হয় এবং এভাবে ধার্যকৃত কর বা খাজনা সরকারের প্রাপ্য হবে যাতে জমিদার বা ভূমি মালিকের কোন অধিকার থাকে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূ–সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব জমিদারদের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দূরীভূত হয়। তাছাড়া রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সরকারী ব্যয় বহুলাংশে কমে যায়। এতদ্ব্যতীত সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাদের সরকারের প্রতি আনুগত্য রাখতে হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ সম্ভবতঃ এ ধারণাও পোষণ করেছিলেন যে, জমিদাররা ধণাঢ্য হবেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত বিলাসদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতঃ এ সম্পর্কিত শুল্ক প্রদান করে সরকারী কোষাগারকে সমৃদ্ধ করবেন। তাছাড়া ভূমির উন্নতি বিধানে জমিদারেরা বিশেষ সচেষ্ট হবেন। শেষোক্তটি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ অধিকাংশ জমিদাররা তাদের গ্রাম্য বসত–বাড়ী ত্যাগ করে শহরে বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হন। জমিদাররা অধীনস্থ প্রজাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন শুরু করেন এবং দেশের সকল উদ্বৃত্ত মূলধন ভূমি ব্যবসায়ে উৎপাদনহীন অবস্থায় বা অকেজো অবস্থায় পুঞ্জীভূত হয়।

৪. পত্তনী তালুক রেগুলেশন, ১৮১৯

১৮১৯ সনের ৮ নম্বর আইন বেংগল পত্তনী রেগুলেশন নামে খ্যাত। উক্ত আইনে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট কর বা খাজনা ধার্যকরণ, উত্তরাধিকার সূত্রে ভূ–সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর যোগ্যতা এবং উচ্ছেদহীনতা স্বীকৃত হয়। তবে, বকেয়া খাজনার জন্য ভূ–সম্পত্তি সরাসরি বিক্রি এবং জমা ব্যর্থতায় ভূ–সম্পত্তি জমিদারের দখলে আনার ব্যবস্থাও ছিল।

৫. এলিউভিয়ন এন্ড ডাইলিউভিয়ন রেগুলেশন, ১৮২৫

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ–প্রকৃতিতে নদীর ভাংগন– গড়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূ–বন্দোবস্ত ও ভূ–মালিকানায় এর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই প্রেক্ষিতে সরকার ১৮২৫ সনের ১১ নম্বর রেগুলেশন্স বিধিবদ্ধ করেন। উক্ত আইন পায়ওয়াস্‌ত্‌ ও সিকস্‌থ্‌ আইন বলেও পরিচিত। নদীর ভাংগনকে 'সিকস্‌থ্‌' এবং নদীপাশে ভূ–গঠনকে 'পায়ওয়াস্‌থ্‌' বলা হয়ে থাকে।

উক্ত আইনে বলা হয় যেঃ

(১) নদী পাশে ভূ-গঠনে হলে এর মালিকানা দীর্ঘ প্রতিষ্ঠাত ও সুনির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(২) যদি ঐ ধরনের স্থানীয় প্রথা না থাকে তাহলেঃ

(ক) ধীরে ধীরে জাগ্রত চরের মালিকানা নদীর উক্ত পাশের ভূ-স্বামীর হবে, তাঁর সরকারকে খাজনা দিতে হবে।

(খ) যখন কোন ভূমির অংশ অকস্মাৎ তীর থেকে বিচ্যুত হয় এবং অন্য অংশের সাথে যুক্ত হয় অথচ যুক্ত অংশের পরিষ্কার পরিচিতি থাকে তাহলে ঐ অংশের মালিকানা মূল মালিকেরই থাকবে।

(গ) যখন বড় নাব্য নদীতে চর জাগ্রত হয় এবং চর থেকে নদীতীর পর্যন্ত বছরের কোন সময় হেঁটে যাওয়া যায় (fordable), তাহলে তীরবর্তী ভূ-স্বামী থাকলে সরকারকে রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে তিনি উক্ত চরের মালিক হবেন এবং এরকম তীরের মালিকানা কারো না থাকলে তা সরকারী খাস্ জমিরূপে পরিগণিত হবে।

(ঘ) অনাব্য সরু নদীতে চর জেগে উঠলে এবং দু'তীরের দু'জন মালিক হলে মাছ ধরার অধিকার (জলকর) এর মালিকের উপর উক্ত মালিকানা বর্তাবে।

(ঙ) মালিকানা সংক্রান্ত কোন সংঘাত বা বিরোধ দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত হবে এবং আদালত স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত প্রথাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন।

উক্ত আইনের আওতায় লোপেজ বনাম মদন মোহন ঠাকুর এর মামলা সুপ্রসিদ্ধ। বাদী ফেলিক্স লোপেজ এর গংগা তীরবর্তী বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিকানা ছিল। নদীর ভাংগন ও গতি পরিবর্তনের ফলে ১৮৪০ সনে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং বিবাদীর সম্পত্তি গংগার তীর স্পর্শ করে। কয়েকবছর পর গংগার জলভাগ দূরে সরতে থাকে এবং পরিত্যক্ত স্থলভাগ ক্রমশঃ শক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। লোপেজ উক্ত জমির মালিকানা দাবী করেন। সদর আমিন বাদীর পক্ষে ডিগ্রী প্রদান করেন কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপীলে কোলকাতা হাইকোর্ট তা বাতিল করে দেন। বাদী হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়ের করেন। প্রিভি কাউন্সিল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যেহেতু বাদী উক্ত ভূমির দাবী কখনও পরিত্যাগ করেননি এবং এটা সনাক্তকরণ যোগ্য ছিল তাই বিবাদী একে পলিসঞ্চয় দ্বারা তার ভূমি বৃদ্ধি বলে দাবী করতে পাররেন না।

৬. বেংগল প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫

১৮৮৫ সনের বেংগল টিনান্সী এক্ট বা প্রজাস্বত্ব আইন (সংক্ষেপে 'বিটি এক্ট' বলে পরিচিত) একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গৃহীত হয় এবং এর পেছনে অনেক যুগের আন্দোলন ছিল এবং এটা দেশীয় নেতাদের নেতৃত্ব ও প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। এ আইনে প্রজাদের বেশ কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়। উক্ত বংগদেশ প্রজাস্বত্ব আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রজারা অনুমোদিত প্রজা হিসেবে গণ্য হয়ঃ-

(ক) জোতদার ও অধীনস্থ জোতদার (Tenure-holder)

(খ) রায়ত

(গ) অধীনস্থ রায়ত। অর্থাৎ রায়তের অধীনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমি ধারণকারীরা।

উক্ত আইনের আওতায় নিম্নোক্ত রায়তদেরকে প্রজা বলে গণ্য করা হয়ঃ

(ক) নির্দিষ্ট হারের খাজনার জমি ধারণকারী রায়ত – অর্থাৎ যে সমস্ত রায়তরা নির্দিষ্ট খাজনায় বা খাজনার নির্দিষ্ট হারে স্থায়ীভাবে জমিধারণ করেন।

(খ) অধিকারী রায়ত– এধরনের রায়ত যারা যে জমিধারণ করেছেন সে জমিতে তাদের অধিকারকরণের অধিকার রয়েছে।

(গ) অধিকারহীন রায়ত– যে সমস্ত রায়তের এররকম জমি অধিকারকরণের অধিকার নেই।

নির্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদানকারী রায়তদেরকে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ প্রদান করা হয়ঃ–

(ক) তারা তাদের অধিকারভুক্ত ভূ–সম্পত্তি রেজিষ্ট্রিকৃতবাবে হস্তান্তর করতে পারবে।

(খ) জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যদি কোন নির্দিষ্ট শর্ত থেকে থাকে এবং সে শর্ত যদি উক্ত প্রজা ভংগ করে কেবলমাত্র তখনই তাকে উচ্ছেদ করা যাবে।

(গ) উক্ত রায়ত ক্রমাগত ১২ বৎসর একই গ্রামে থাকলে তাকে স্থিরীকৃত রায়ত বলে গণ্য করা হবে।

(ঘ) উক্ত রায়তের জমি চাষ করার, গাছ লাগানোর, গাছ কাটা ও ভোগ করার অধিকার থাকবে।

অধিকারী রায়তের নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ উক্ত আইনে স্বীকৃত হয়ঃ

(ক) তিনি উক্ত ভূ–সম্পত্তিকে তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবেন, তবে উক্ত সম্পত্তির মান নষ্ট করতো পারবেননা। (যথা, কৃষি জমিকে খাল বানানো যাবে না)

(খ) তিনি তার জমিতে গাছ লাগাতে পারবেন ও গাছ কাটতে পারবেন এবং গাছের ফলফুল, কাষ্ঠ ইত্যাদি ভোগ করতে পারবেন।

(গ) তিনি যুক্তিসম্মতভাবে স্থিরীকৃত খাজনা প্রদান করবেন।

(ঘ) তাঁকে খাজনা প্রদান না করার কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে উচ্ছেদ করা যাব না।

(ঙ) তাঁর ভূ–সম্পত্তি তাঁর বংশধররা বংশানুক্রমে ভোগ করতে পারবে।

(চ) তাঁর ভূ–সম্পত্তি তিনি প্রয়োজনে হস্তান্তর করতে পারবেন।

অধিকারহীন রায়তদের কেবলমাত্র নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ছিলঃ

(ক) কেবলমাত্র চুক্তিবদ্ধ পরিমাণে খাজনা প্রদান করা।

(খ) রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল অথবা ৪৬ নম্বর ধারার মামলা ব্যতীত খাজনার পরিমাণ বাড়ানো যাবেনা।

খাজনা বৃদ্ধি হলে খসড়া চুক্তি হিসেবে প্রজাকে প্রথমে জানাতে হতো। প্রজা ৩ মাসের মধ্যে অস্বীকৃতি জানাতে পারতো এবং অস্বীকৃতির তিন মাসের মধ্যে জমিদার উক্ত বিষয়ে মামলা করতে পারতেন।

উক্ত আইন অনুযায়ী অধিকারবিহীন প্রজাদেরকে নিম্নোক্ত কারণে উচ্ছেদ করা যেতঃ

(ক) খাজনা অনাদায়ী হলে।
(খ) চুক্তির শর্ত ভংগ করতঃ জমি ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে।
(গ) চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে।
(ঘ) ন্যায্য খাজনা প্রদান করা না হলে।

উক্ত আইন জোতদার শ্রেণী সৃষ্টি করে। জোতদার (Tenure-holder) বলতে প্রধানতঃ ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি ভূ-স্বামী (Proprietor) বা জোতদারের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে বা প্রজা স্থাপন করে তা চাষের অধীনে আনার জন্য জমিধারণ করার অধিকার অর্জন করেছেন। এরূপ অধিকার অর্জন করেছেন এরকম ব্যক্তির স্বার্থের উত্তরাধিকারদেরকেও জোতদার বলা হবে।

রায়ত বলতে প্রধানতঃ ঐ ব্যক্তিকে বুঝাতো যিনি নিজে বা তার পরিবারের লোকদের দ্বারা অথবা চাকর বা শ্রমিকদের দ্বার বা অংশীদারদের সাহায্যে জমি রাখবার অধিকার অর্জন করেছেন। এরূপব্যক্তির স্বার্থের উত্তরাধিকারীরাও এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে ভূ-স্বামী অথবা অন্য জোতদার এর অধীনে জমি ধারণ না করলে তাকে রায়ত বলা যেতনা। কোন প্রজা জোতদার না রায়ত তা নির্ণয় করার জন্য আদালত নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতেনঃ

(ক) স্থানীয় রীতিনীতি,
(খ) যে উদ্দেশ্যে প্রজাস্বত্বের অধিকার মূলতঃ অর্জন করা হয়েছিল,
(গ) যে ক্ষেত্রে কোন প্রজার ১০০ বিঘার অধিক জমি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে অন্যরূপ বিরোধী কিছু না দেখানো হলে ঐ প্রজাকে জোতদার বলে মনে করা হতো।

উক্ত আইনে জোতদার ও রায়তের সংজ্ঞা অস্পষ্ট ছিল। কোন ব্যক্তির যার কোন সময় নিজের বা পরিবারের লোকজন দ্বারা বা চাকর-বাকর দ্বারা চাষ করাবার জন্য বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল, তা তার কাজের দ্বারা তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ অধীনস্থ রায়তের হাতে চলে যেতে পারতো। ফলে তিনি খাজনা গ্রহীতাতে পরিণত হতে পারতেন।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনে রায়ত কোন জমিদার বা জোতদারের চাষী প্রজা এবং অধীনস্থ রায়ত হলো রায়তের প্রজা। প্রত্যেক চাষীই যে রায়ত হবেন এমন নয়। রায়ত হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন জমিদার অথবা জোতদারের অধীনে প্রজা হিসেবে ভূমি চাষ করেন। সংশ্লিষ্ট চাষী ভূমিতে কোনরূপ স্বার্থবান কিনা এটাই বিচার্য বিষয় ছিল। যদি কোন ইজারার শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহণ কারীকে (Lessee) স্বয়ং জমিচাষ করতে হতো এবং অন্য প্রজাকে বন্দোবস্ত দেয়া যেতনা সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহণকারী জোতদার নয়, বরং রায়তরূপে গণ্য হতেন।

উক্ত আইনানুযায়ী যে সকল ব্যক্তি একাধিক্রমে ১২ বৎসর পর্যন্ত কোন গ্রামে অবস্থিত জমি রায়ত হিসেবে ধারণ করেছেন তাদেরকে সেই গ্রামের স্থিরীকৃত রায়ত হিসেবে গণ্য করা হয়। এরূপ ব্যক্তির একই গ্রামের জমি ধারণ করলে চলবে। এ জমি ভিন্ন ভিন্ন খন্ডও হতে পারে, নির্দিষ্ট জমি না হলেও চলতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে জমি লাভ করলে যে ব্যক্তির কাছ থেকে জমি পাওয়া গেল তাও এই নির্দিষ্ট ১২ বৎসরের অন্তর্ভূক্ত। স্থিরীকৃত রায়তকে একা অথবা অন্য লোকেরসহ অংশীদার হিসেবে জমিধারণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি একবার স্থিরীকৃত রায়তের একা অথবা অন্য লোকেরসহ অংশীদার হিসেবে জমিধারণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি একবার স্থিরীকৃত রায়তের মর্যাদা অর্জন করতে তার ঐ গ্রাম থেকে অপসারণের পরেও উক্ত মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে, যদি তিনি এক বৎসর সময়ের মধ্যে ঐ গ্রামে ফিরে আসেন এবং যে কোন জোতজমা গ্রহণ করেন। কোন রায়ত জমিদার কর্তৃক অন্যায়ভাবে উচ্ছেদকৃত হলে অবশ্য এক বৎসরের অধিককাল হলেও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে।

অধিকারী রায়ত ও স্থিরীকৃত রায়তের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সকল স্থিরীকৃত রায়তই অধিকারী রায়ত কিন্তু সকল অধিকারী রায়ত স্থিরীকৃত রায়ত নন। কোন ব্যক্তি নিজে অথবা অংশতঃ নিজে এবং অংশতঃ যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করেছেন তার মাধ্যমে কোন গ্রামে একাধিক্রমে ১২ বৎসর জমিধারণ করলেই কেবলমাত্র স্থিরীকৃত রায়ত হতে পারেন। কিন্তু অধিকারী রায়ত হতে হলে স্থিরীকৃত রায়ত হওয়া ছাড়াও অন্যভাবে যেমন, ক্রয়, উত্তরাধিকার, সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থিরীকৃত রায়ত নয় এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে অধিকার হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত জমিতে অধিকার করে রাখার অধিকার ব্যতীত অধিকারী রায়ত হয় না। এমনকি জমিতে দখল থাকা স্বত্বেও কোন স্থিরীকৃত রায়তের জমিতে অধিকার করে রাখার অধিকার নাও থাকতে পারে, যথা, জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সরকার কর্তৃক ধারণকৃত জমি যা বছরের পর বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয় এমন জমি অথবা উতবন্দী, চর বা দিয়ারা জমি যদি রায়ত উক্ত জমি একাধিক্রমে ১২ বছর পর্যন্ত ধারণ না করে থাকে অথবা কর্ম জোত বা ঘাটওয়ালী জোত।

উক্ত ১৮৮৫ সনের আইনের অগ্রক্রয়াধিকারের ব্যবস্থাও রাখা হয়। কোন জোত জমার কোন অংশ বা খন্ড হস্তান্তর করা হলে এক বা একাধিক সহ-অংশীদার কর্তৃক অগ্রক্রয়াধিকারের অধিকার প্রয়োগ করা চলতো। তবে উক্ত হস্তান্তর বিনিময়, ইজারা অংশ বিভাগ হিবা-বিল-এওয়াজ[৩] বাদে অন্য প্রকার হিবা বা ওয়াকফ্ অথবা ধর্মীয় বা দাতব্য কারণে উৎসর্গীকৃত হলে অগ্রক্রয়াধিকার করা যেতো না। নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ৩ মাসের মধ্যে এই অগ্রক্রয়াধিকার প্রয়োগের আবেদন করতে হতো। সম্পত্তির যে মূল্য নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে তা এবং অতিরিক্ত ১০% আদালতে জমা দেয়া অগ্রক্রয়াধিকার প্রয়োগের শর্ত ছিল।

---

৩ মুসলিম আইনে যে দানের পরিবর্তে কিছু প্রকৃত বা প্রতীক গ্রহীতা থেকে গ্রহণ করা হয়, তাকে 'হেবা-বিল এওয়াজ' বলে।

উক্ত আইনে সংরক্ষিত স্বার্থ সম্পর্কে বলা হয় যে যখন কোন জোত বা জোত জমা বকেয়া আদায়ের ডিগ্রী কার্যকরী করণের জন্য বিক্রয় হয় তখন সেখানে ক্রেতার স্বার্থ রদ হয়না। এটাকেই সংরক্ষিত স্বার্থ বলা হতো। নিম্নলিখিতগুলি সংরক্ষিত স্বার্থের অন্তর্ভূক্ত ছিলঃ

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে বিরাজমান অধীনস্থ জোত।

(খ) কোন বর্তমান অস্থায়ী বন্দোবস্তের কার্যক্রম দ্বারা অধীনস্থ জোত ঐ বন্দোবস্তের সময়ের জন্য নির্ধারিত খাজনায় জোত হিসেবে অনুমোদিত।

(গ) কোন ইজারা যার উপর বসতবাড়ী, কলকারখানা বা অন্য স্থায়ী গৃহাদি নির্মিত হয়েছে, অথবা যার উপর স্থায়ী বাগান পুকুর, খাল, উপাসনাগার, কবরস্থান, শ্মশান ইত্যাদি তৈরী হয়েছে।

(ঘ) কোন আদালত কর্তৃক অথবা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত খাজনায় পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জমিধারণ করছে এমন অনধিকারী রায়তের অধিকার। বলা বাহুল্য কোন অধীনস্থ রায়তের অধিকার করে রাখার অধিকার থাকলেও তার স্বার্থ সংরক্ষিত স্বার্থ বলে গণ্য ছিলনা।

(ঙ) উপরোক্ত প্রকারে ভূমি প্রদত্ত হলে ন্যায় ও যুক্তিসম্মত খাজনায় জমি ধারণ করে আছে এরূপ অধিকারী রায়তের উপর প্রদত্ত অধিকার।

(চ) নির্ধারিত খাজনায় জমি ধারণ করে আছে এরূপ নির্ধারিত হারের রায়ত অথবা এরূপ খাজনার হারে রায়ত যে খাজনার হার বিশ বৎসরে পরিবর্তিত হয়নি।

(ছ) যে জমিদারের নির্দেশে জোত বা জোতজমা বিক্রি হয়েছে অথবা তার পূর্ব স্বার্থাধিকারীর কোন স্বার্থ বা অধিকার যা খোলাখুলি বা লিখিতভাবে সাময়িকরূপে সৃষ্টি করার জন্য প্রজাকে অনুমতি প্রদান করা হয়।

১৮৮৫ সনের উক্ত বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন ভূমিতে চাষীর স্বত্ব বা অধিকার আদায়ের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি ছিল। উক্ত আইনে চাষী প্রজাদেরকে বর্ণিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতঃ প্রত্যক্ষ শ্রেণীর রায়তের স্বত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রতিখন্ড ভূমি জরিপ করতঃ রায়তের নাম, রায়তের শ্রেণী, জমির পরিমাণ ও শ্রেণী ও খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত খতিয়ান প্রণয়নের বিধান রাখা হয়। রায়তরা জমিতে তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও ভোগের জন্য জরিপে প্রণীত এ খতিয়ানের উপর নির্ভরশীল ছিল।

৭. ইষ্ট বেংগল নন–এগ্রিকালচারাল টিনান্সি এ্যাক্ট ১৯৪৯

পূর্ব বাংলা অকৃষিজাত প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৪৯ অনুযায়ী অকৃষিজাত জমি বলতে ঐসব জমি বুঝানো হয় যেটা কৃষি বা ফলমূলের চাষ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণত বসত বাড়ী, চা– বাগান বা মূলতঃ কৃষিকাজের জন্য ইজারা প্রদানকৃত হয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত জমি এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী অকৃষিজাত রায়ত বলতে রায়ত এবং অধীনস্থ রায়ত বুঝানো হয়। অকৃষিজাত রায়ত অকৃষিজাত জমি আবাসিক কারণে, শিল্প উৎপাদনের জন্য, ব্যবসা

বাণিজ্যের জন্য অথবা ধর্মীয় ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন। উক্ত আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী কোন রায়ত পাকা ঘর, মসজিদ, মন্দির বা অন্যান্য উপসনালয়, পুকুর খনন, কাষ্ঠ সংগ্রহ, পুষ্পোদ্যান ইত্যাদির জন্য উক্ত জমি ব্যবহার করতে পারেন। উক্ত আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী যখন কোন রায়ত কমপক্ষে ১২ বৎসরের জন্য ইজারা নেন তখন প্রিমিয়াম বা সেলামী ব্যতীরেকে যুক্তিসম্মত খাজনায় চিরস্থায়ীভাবে উক্ত লীজ নবায়ন করার অধিকারী হন।

উক্ত আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী যদি কোন অকৃষিজাত ভূমিতে প্রজা কোন লিখিত ইজারা না নিয়ে অথবা এক বৎসরের বেশী অথচ ১২ বৎসরের কম সময়ে উক্ত জমিতে অবস্থান করেন অথবা ইজারার কোন শর্ত না নির্ধারিত হয়ে থাকে তখন নিম্নোক্ত কারণে তাকে উচ্ছেদ করা যেতঃ

(ক) উক্ত জমিকে যেভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন যদি জমিটি সেভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে,

(খ) মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে।

(গ) ৬ মাসের নোটিশ প্রদান করে।

তবে যদি তার উপর ঘর-বাড়ি নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে যুক্তিসংগত ক্ষতি পূরণ প্রদান ব্যতীত তাকে প্রজাস্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করা যাবেন।

উক্ত আইনের ২০ নম্বর ধারা অনুযায়ী একজন অধীনস্থ প্রজা এ আইনের শর্ত সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিগুলোর যে কোন একটি মাধ্যমে উচ্ছেদের দায়ে দায়ী হবে এবং অন্য কোন উপায়ে নহে, যথাঃ (ক) এ আইনের ৪ নম্বর ধারার উদ্দেশ্যে যদি কোন প্রজা তার অকৃষিজাত ভূমিটি এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে সে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। (খ) যে লিখিত ইজারার মাধ্যমে কোন অকৃষিজাত ভূমিতে প্রজা অবস্থান করছে তার মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে। তবে যদি কোন অকৃষিজাত ভূমিতে কোন প্রজা সুনির্দিষ্ট ইজারা ছাড়াই অবস্থান করতে থাকে তাহলে জমিদার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রজা ৬ মাসের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত হতে পারে।

যদি কোন প্রজা ও জমিদার কোন ভূমি উন্নয়নমূলক কার্যে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে ৬৫(২) ধারা মোতাবেক অকৃষিজাত ভূমির প্রজাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, যদিনা তার জমিদারের অন্য প্রজার স্বার্থের তাতে ব্যাঘাত ঘটে। ভূমি উন্নয়ন কাজের মধ্যে রাস্তা বা উপরাস্তার সুবিধাকরণ, আলো বাতাস চলার জন্য খোলা স্থানের ব্যবস্থা করণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করণ, নর্দমা স্থাপনের ব্যবস্থাকরণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ভূমি উন্নয়নমূলক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং প্রজা কর্তৃক সম্পাদিত কর্মটি ভূমি উন্নয়নমূলক কিনা এ সম্পর্কে বিরোধ উত্থাপিত হলে কালেক্টর (ডিপুটি কমিশনার) তা নিষ্পত্তি করবেন এবং তার রায়ের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করা যেতে পারে এবং এরূপ আপীলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮. ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন

জমিদারী প্রথার বিভিন্ন কুফলের ফলে বিশ শতকের ত্রিশ দশকের দিকে জমিদারী উচ্ছেদ আন্দোলন ক্রমে তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। সরকার প্রজা ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃ নির্ধারণের জন্য ১৯৩৮ সনে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এর নেতৃত্বে একটি ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন নিয়োগ করতে বাধ্য হন। ফ্লাউড কমিশন ক্ষতিপূরণ সহকারে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এর সুপারিশ করেন।

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশসমূহ ১৯৪৪ সনের বেংগল এডমিনিষ্ট্রেটিভ ইনকোয়েরী কমিটি সমর্থন করে এবং সে অনুযায়ী জমিদারী উচ্ছেদের একটি বিল ১৯৪৭ সনে বেংগল লেজিস্লেটিভ এসেম্বলীতে উথাপিত হয়। কিন্তু দেশ বিভাগের কারণে ঐ সময় উক্ত পরিষদে তা আলোচিত বা গৃহীত হতে পারেনি। দেশ বিভাগের পর দেখা যায় যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে রায়তরা প্রায় ১০ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করেন, কিন্তু মধ্যস্বত্বের কারণে সরকারী কোষাগারে মাত্র ১·৮৫ কোটি টাকা জমা হয় এবং বাকী অর্থ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী পেয়ে থাকেন।[৪]

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং প্রজা জনসাধারণের দাবীর প্রেক্ষিতে তদানীন্তন পুর্ব বংগ আইন পরিষদে ১৯৫০ সনে ইষ্ট বেংগল একুইজিশন এন্ড টিন্যান্সী বিল উথাপিত হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও সংশোধনীর পর ১৯৫১ সনের ১৬ই মে তারিখে উক্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। যদিও এটা ১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন তবু উথাপিত বছরের সূত্র ধরে এটা ইষ্ট পাকিস্তান ষ্টেট একোইজিশন এন্ড টিন্যান্সী এক্ট, ১৯৫০ নামে অভিহিত। উক্ত আইনের রূপরেখা নিম্নরূপ ছিলঃ

(১) উক্ত আইন দেড়শ বছরের পুরানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে এবং উক্ত আইনে প্রকৃত চাষীদের সরাসরি সরকারকে খাজনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

(২) উক্ত আইন ভূমি ব্যবস্থার সমস্ত মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন করে এবং তদসংগে সকল খাস জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

(৩) উক্ত আইনে পরিবারের মাথা পিছু জমি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। প্রথমে উক্ত পরিমাণ পরিবারপিছু ১০০ বিঘা বা মাথাপিছু ১০ বিঘা (যেটা বেশী) ছিল কিন্তু ১৯৫৮ সনে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর উক্ত পরিবার পিছু পরিমাণ ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত করা হয়।

(৪) কৃষি অর্থনীতিতে যাতে বিরূপ প্রক্রিয়া না হয় সে জন্যে কোন ক্ষেত্রে উক্ত আইনের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়। যথাঃ–ডেয়ারী ফার্ম, চিনিকলসমূহ বা বিদ্যুৎচালিত কারখানা সমূহ।

(৫) উক্ত আইনে প্রজাদেরকে পুর্ণ অধিকারী স্বত্ব এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা দেয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে কোন মধ্যস্বত্ব স্থাপন রহিত করা হয়।

(৬) জমিদারদেরকে তাদের আয় বন্ধ হওয়া জনিত ক্ষতি–পুরণ হিসাবে ক্ষতি পুরণ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

(৭) উক্ত আইনে জমিদারদেরকে দেয় ক্ষতি পুরণের পরিমাণ নিম্নরূপ রাখা হয়ঃ

৪· দেখুন, Muhammad Ismail, Land Laws of East Pakistan, Part I (Dhaka: Progressive publishers, 1963), p.8

সারণী —১

১৯৫০ এর জমিদারী উচ্ছেদ আইনে ক্ষতিপুরণের হার

নীট বার্ষিক আয়	ক্ষতিপুরণের পরিমাণ	
৫০০ টাকা পর্যন্ত	উক্ত আয়ের এককালীন	১০ গুণ
৫০১ টাকা–২০০০ টাকা	,, ,, ,,	৮ গুণ
২০০১ টাকা–৫০০০ টাকা	,, ,, ,,	৭ গুণ
৫০০১ টাকা–১০,০০০ টাকা	,, ,, ,,	৬ গুণ
১০,০০১ টাকা–১২,০০০ টাকা	,, ,, ,,	৫ গুণ
২৫,০০১ টাকা–৫০,০০০ টাকা	,, ,, ,,	৪ গুণ
৫০,০০১ টাকা–১,০০,০০০ টাকা	,, ,, ,,	৩ গুণ
১,০০০০০ টাকার উপরে	,, ,, ,,	২ গুণ

উৎস ঃ ১৯৫০ সনের ই–বি–এস–এ–টি আইন, ধারা ৩৭

(৮) উক্ত আইনে সমবায়ী চাষাবাদ বা ঐচ্ছিক টুকরাকৃত জমির একত্রীকরণের ব্যবস্থা রাখাহয়।

(৯) খাস জমির বন্দোবস্তের পরিমাণ প্রয়োজনে বৃহদাকার খামার ও বিশেষতঃ দুগ্ধ খামারের জন্যে বর্ধন করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

(১০) কোন কোন খাস জমি অধিগ্রহণের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়। যথাঃ– চা–বাগান, রাবার চাষাবাদ ক্ষেত্র, ফলমুলের বাগান এবং বৃহৎ শিল্পের উৎসে ব্যবহৃত বাগানাদি।

(১১) অকৃষিজাত উন্মুক্ত জমি, ওয়াকক ও দেবোত্তর জমি অধিগ্রহণের আওতায় বাইরে রাখাহয়।

সরকারের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উক্ত আইনের ৩ ধারায় বলা হয় যে সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমেবিভিন্ন জমিদারী নিজআয়ত্বে আনবেন। উক্ত প্রক্রিয়া প্রথমে বরিশাল থেকে শুরু হয়। ১৯৫৪ সনে মুসলীম লীগ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর যখন ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় তখন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে উক্ত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখে একটি সর্বজনীন গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার জমি সংক্রান্ত সকলরাজস্ব গ্রহীতার স্বার্থ নিজে গ্রহণ করেন। এর ফলস্বরূপ অকৃষিজাত উন্মুক্ত জমির যুক্তিতে ইউসুফ আলী চৌধুরীর টেপাখোলা হাট সংক্রান্ত মামলা, ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পর্কে জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী, চৌধুরী তানভীর আহমদ

সিদ্দিকী, মেহেদী আলম খান পত্নী ও অন্যান্য, রানী ভবাণী, রাজেন্দ্র নারায়ন প্রমুখের ভিন্ন ভিন্ন রীট হাইকোর্টে দাখিলকৃত হয়। সরকার উপায়ন্তর না দেখে ১৯৬০ সনে ১২ নম্বর অধ্যাদেশ জারী করতঃ উন্মুক্ত অকৃষিজাত জমিসমুহ উক্ত আইনের আওতাধীন করেন।

উক্ত আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে অগ্রক্রয় (প্রিএমপশন) উল্লেখ্য। ১৮৮৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬ (এফ) ধারা অনুযায়ী কেবল শরীকরাই অগ্রক্রমের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদেরকেও উক্ত অধিকার প্রদান করা হয়। তবে উত্তরাধিকার সুত্রে শরীকের ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সম্পত্তি বদলী করণের ক্ষেত্রে, ওয়াকফের ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জমির ক্ষেত্রে উক্ত ক্রয় –অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়।

১৯৫০ সনের উক্ত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকলেও সে সময় আইনে জোতদারীপ্রথার উপর আঘাত দেয়া হয়নি। অথচ দেশ বিভাগের পুর্ব থেকেই বর্গা প্রথার বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন হয়েছিল। এর মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার এক বছর আগে সারা বাংলাদেশে বর্গা–প্রথা সংস্কারের দাবীতে অধিকারীদের ব্যাপক জংগী সংগ্রাম উল্লেখ্য।

১৯৪৭ সনে অবিভক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী জনাব হোসেন সোহওরাওয়ার্দী বিদ্যমান ভাগ–চাষ প্রথার সংস্কার কল্পে আইনের এক খসড়াও তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের মধ্যে জোতদারদের প্রভাবের ফলে এ আইন শেষ পর্যন্ত পরিষদে উত্থাপিত হয়নি।[৫]

৯. *পরিত্যক্ত ও অর্পিত সম্পত্তি*

ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুল্‌স (১৮৮২ সনের ১ নম্বর রুল্‌স) অনুযায়ী শত্রু সম্পত্তি সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর পাকিস্তান ত্যাগ করতঃ ভারতে গমনকারী সংখ্যালঘুদের জন্য উক্তবিধি বলবৎ রাখা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানীরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেল তখন তাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির বন্দোবস্তের ও প্রয়োজন পড়ে। ভারত বাংলাদেশের বন্ধু হওয়ায় পুর্বোল্লেখিত শত্রু সম্পত্তিকে ভেস্টেড প্রপার্টি (অপিত সম্পত্তি) নামাকরণ করা হয় এবং প্রপার্টি সম্পর্কে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশনম্বর ২৯ জারী করা হয় যা পরবর্তীতে ৭৪ সনের প্রথমে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যাদেশ এবং তার পরে ৪৫ ও ৪৬ নং আইনে রূপান্তরিত হয়। এবান্ডনড্ প্রপার্টির ক্ষেত্রে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদে শ নম্বর ১৬ উল্লেখ্য। পাকিস্তানীদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি প্রধানতঃ নগর এলাকায় ছিল।

১৯৬০ ও ১৯৬৪ সনের সাম্প্রদায়িক দাংগার পর ১৯৬৪ সনে ডিস্টার্বড পাসন্‌স রিহেবিলিটেশন অধাদেশ (১৯৬৪ সনের ১ নং অধ্যাদেশ) জারী হয়। এতে বলা হয় যে,

[৫] দেখুন, অজয় রায়, <u>বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থাঃ সংকট ও সমাধান</u> (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক্‌স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃঃ ১০।

হিন্দুরা জমি বিক্রি করতে গেলে সরকারের অনুমতি লাগবে। এর উদ্দেশ্য যদিওবা মহৎ হতে পারে যাতে লোকেরা ঠকিয়ে বা ভয় দেখিয়ে অত্যন্ত কম দামে সংখ্যালঘুদের জমি ক্রয় করে না নেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে টাউটদের উপদ্রব খুব বেড়ে যায়। বাংলাদেশ হওয়ার পর সরকার এবান্ডনড্ ও ভেস্টেড সম্পত্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বিশেষভাবে গঠিত কমিটির হাতে দেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসনতথা মহকুমা প্রশাসকের হাতেই বেশীরভাগে দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১০. স্বাধীনতা উত্তর সংস্কারাদিঃ

স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকার কয়েকটি জরুরী ভূমি সংস্কারমুলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৬] যথাঃ

(ক) ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কৃষি জমিতে আরোপিত বকেয়া ও সুদসহ সকল প্রকার ভূমি রাজস্ব মওকুফ করা হয়। ভূমি রাজস্ব মওকুফ হবার ফলে অবশ্য সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ৩৬ কোটি টাকা।

(খ) ১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে ২৫ বিঘার কম জমির মালিক পরিবারকে ভূমি রাজস্ব প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অবশ্য এর ফলে সরকার বার্ষিক ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হন।

(গ) প্রতিটি পরিবারের জন্য আবাদী জমির সর্বোচ্চ সীমা পুনর্বার ১০০ বিঘাতে কমিয়ে আনা হয় (প্রেসিডেন্টের আদেশ নং ৯৮/১৯৭২)

(ঘ) সরকারী জমি বন্টনে সালামী নেয়া হবে না বলে স্থির করা হয়। এর ফলে সরকারের প্রতি বছর ৪ কোটি৯০ লাখ টাকার আয় কমে যায়। ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন কৃষি পরিবারের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমি বন্টন করা হবে বলে ঠিক করা হয়।

(ঙ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকার বড় বড় খন্ডে অববাহিত জমি কৃষকদের সমবায়ের কাছে পত্তন দিবেন বলে স্থির করা হয়। এ সমবায়গুলোর ক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্যকে অতিরিক্ত ১ একর করে জমি দেয়া হবে বলে বিধান দেয়া হয়। যেসব খন্ডে ৫০ থেকে ৫০০ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে সেগুলো সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে যোগ দেয়া শর্তে চাষীদের সাথে স্বতন্ত্রভাবে বন্দোবস্ত দেয়া হবে বলে স্থির করা হয় এবং যেসব খন্ডের আয়তন ৫০০ একরের বেশী (প্রধানতঃ উপকূলীয় অঞ্চলে) সেগুলো সমবায় চাষের জন্য গঠিত গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া হবে বলে সরকারী সিদ্ধান্ত হয়।

(চ) ১৯৭৪ সালে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব), উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জমি বন্টন কমিটি গঠিত হয়।

(ছ) ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১৩৫ অনুসারে সকল নদীগর্ভের জেগে ওঠা চর সরকারী খাস্ জমি হিসাবে সরকারের কাছে অর্পিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

(জ) মজা পুকুরসহ সকল পতিত জমি পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য একটি জাতীয় বোর্ড গঠনের ও পরিকল্পনা নেয়া হয়।

৬·দেখুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন (জানুয়ারী ১৯৮৩) পৃঃ ২১–২৪।

(ঝ) মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহীতাদের খাই খালাসী জমি মুক্ত করার বিষয়ে ১৯৭২ সালে বিধান দেয়া হয় যে, অনূর্ধ ৭ বছরের মধ্যে খাই খালাসী সূত্র অনুযায়ী বন্ধককৃত জমি বন্ধকদাতার কাছে প্রত্যার্পিত হবে।

(ঞ) হাট বাজারের ইজারাদারী প্রথার বিলোপ করা হয়। এর পরিবর্তে হাট বাজারের স্থায়ী দোকানদার ক্রেতা বিক্রেতা এবং ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি বেসরকারী কমিটি গঠন করা হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ নেয়ার ফলে চাষীরা খুব একটা লাভবান হননি, কারণ ২৫ বিঘার কম মালিকদের খাজনা মাফ ও সাধারণভাবে ভূমি কর হ্রাস করা হলেও অন্যদিকে বিবিধ কর ও উপকর আরোপিত হয়েছিল। ১৯৭৬ সনে এ ধরনের সব কর শুল্ককে ভূমি উন্নয়ন কর নামে একত্রিত করা হয়। যেহেতু কর ও উপকর সাধারণভাবে প্রকৃত ভূমি করের ৩০% ছিল সেহেতু এগুলো সংগ্রহের খরচ আনুপাতিক হারে মূল করের চেয়ে অধিক হয়ে দাড়ায়। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে ৯৯ ভাগ কৃষি পরিবারের ২৫ বিঘার কম জমি রয়েছে বিধায় প্রকৃতপক্ষে এতে সর্বনিম্ন আয় শ্রেণীর লোকদের বিশেষ রেহাই বলে ধরা যায়না।

১১. হাট বাজার ও গুচ্ছগ্রাম

গণ কমিটি কর্তৃক হাট বাজার ব্যবস্থাপনা করার বিধান ১৯৭৫ সালে ভেংগে দিয়ে ইজারাদারী প্রথা পুনঃর্জীবিত করা হয়। অনেক কমিটির সরকারী তহবিলের অপব্যবহার ও আত্মসাৎ, উচ্চ হারে শুল্ক সংগ্রহ কিন্তু হিসাবে কম দেখানো, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ইত্যাদি এর কারণ ছিল। পরবর্তীকালে কিছু কিছু হাট বাজারের ব্যবস্থাপনা পৌরসভার হাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাকীগুলো বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার কাছে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনায় সরকারী জমি চাষীদের পত্তন দেয়ার একটি কর্মসূচী সরকার হাতে নেন তবে উক্ত পরিকল্পনাটি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি এবং কর্মসূচীটি সমবায় সমিতি সমূহের সাথে সার্বিকভাবে সমন্বিত হতে পারেনি। তবুও ১৯৮৯ এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা ৩৪৬ এ দাড়ায়।

১২. ভূমি সংস্কার কমিটি

১৯৮২ সনে সরকার একটি ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করেন। ভূমি সংস্কার কমিটির দায়িত্ব হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করা হয়ঃ[৭]

(১) ভূমির অনুকূলতম উৎপাদন সম্ভাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অস্তিত্বমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণ;

৭· ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৮৩, পৃঃ ১

(২) উৎপাদনশীলতা বর্ধন এবং সম্পদ ও আয়ের ন্যায়ধর্মী বন্টন প্রসারণকল্পে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার কাঠামোর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সুপারিশকরণ;

(৩) সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সংগঠন ও পদ্ধতির দিক নির্দেশনা।

কমিটির কার্যপরিধি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমি সংস্কার বলতে কেবলমাত্র চাষযোগ্য ভূমি বুঝানো হয়। জলাশয়, জলমহল, হাট-বাজার, গোপথ, চারণভূমি ইত্যাদিও কমিটি আলোচনা করেন; তবে ওয়াকফ, দেবোত্তর জমি ও অর্পিত জমির বিশেষ সমস্যাদি এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, চা বাগান আবৃত জমি এবং অন্যান্য উপজাতীয় অঞ্চলের ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কে সংস্কারধর্মী দিক নির্দেশনা এতে স্থান পায়নি।

ভূমি সংস্কার কমিটি ১৯৮৩ সনে তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশ পেশ করেন। তাদের সুপারিশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ্যঃ[৮]

(১) প্রত্যক্ষভাবে চাষকার্যে নিয়োজিত কৃষক পরিবারের ক্ষেত্রে কৃষি জমির (বসতবাড়ী ছাড়া) মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৭৫ মান (Standard) এবং অন্যান্য এলাকায় ১০০ মান বিঘায় নির্ধারিত হবে। অনুপস্থিত মালিক পরিবারের ক্ষেত্রে এই সীমা বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৩০ মান বিঘায় এবং অন্যান্য এলাকার ৫০ মান বিঘায় নির্ধারিত হবে। নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমি বা উদ্বৃত্ত জমি খাস জমি হিসাবে সরকারের কাছে অর্পিত বলে গণ্য হবে।

(২) অর্পিত উদ্বৃত্ত জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনধিক ১০ বিঘার মালিক বা প্রজাস্বত্বের অধিকারী স্ব-চাষী পরিবার, বর্গাশর্তে ব্যবহারকারী বর্গাচাষী, অনধিক ১০ বিঘা জমির মালিক, ব্যবহারকারী পার্শ্ববর্তী জমির মালিক বা ব্যবহারকারীকে পত্তন দেয়া হবে।

(৩) যে সব পরিবারের জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা বা কম তারা ৬০ বিঘার বেশী পাবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে ভূমির মালিক (শ্রম ব্যতীত) উৎপাদনের সকল উপকরণ ব্যয় বহন করেন, সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের ৬৭ $\frac{1}{2}$ ৴ এবং যেক্ষেত্রে বর্গাচাষী (শ্রম ব্যতীত) সকল উৎপাদন উপকরণ বহন করেন, সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের ৩৩ $\frac{1}{2}$ ৴ এবং যেক্ষেত্রে ভূমি মালিক বর্গাদারের সাথে সমভাবে (শ্রম ছাড়া) সকল উপকরণ ব্যয় বহন করেন সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের ৫০৴ ভূমি মালিককে দেয়া হবে।

(৫) বেনামীতে জমি মালিকানা সংরক্ষণ ও হস্তান্তর সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৬) চর অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত যে সব স্থল বিশিষ্ট জলমহল মাছ উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে কিংবা আনা সম্ভব, সেগুলোর নিয়ন্ত্রন মৎস্য বিভাগের প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কাঠামোয় রাখতে হবে।

(৭) পৌর এলাকায় অবস্থিত হাট বাজার পৌরসভার কাছে, থানা সদরে অবস্থিত হাট-বাজার থানা পরিষদকে (পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদকে) ইজারা দিতে হবে। গ্রামে অবস্থিত হাট বাজারের নিয়ন্ত্রণ ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম পরিষদের কাছে থাকবে এবং এসবের

৮ Ibid., পৃঃ ২-৭

ব্যবস্থাপনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট গ্রামে ভূমিহীন বা ভূমিস্বল্প কৃষকদের সমবায় সমিতিসমূহকে দায়িত্ব দিবেন। থানা পরিষদ হাট–বাজারের আয়ের ১% সরকারকে দেবেন, ৯% নিজ তহবিলে জমা করবেন, ১০% হাট–বাজার উন্নয়নে প্রযোজিত করবেন এবং ৮০% ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ভূমিহীন বা ভূমিস্বল্প সমবায় সমিতির জন্য নির্দিষ্ট রাখবেন।

(৮) জেগে উঠা চর জমির সত্বর জরীপ ও পত্তনের জন্য জেলা প্রশাসক বিশেষভাবে দায়ী থাকবেন। চর উঠার অনুর্ধ তিন মাসের মধ্যে জরীপকার্য সম্পন্ন করতে হবে এবং জরীপকাজ শেষ হওয়ার অনুর্ধ তিন মাসের মধ্যে খাসজমি পত্তন পাওয়ার যোগ্য পার্শ্ববর্তী এলাকার স্ব–চাষী বা ভূমিহীন ও ভূমিস্বল্প চাষীকে পত্তন দিতে হবে।

(৯) খোরপোষের নিম্নতম প্রয়োজনে মজুরীর সর্বনিম্ন মাত্রা ৩ $\frac{১}{২}$ সের চালে বা সমপরিমাণ টাকার অংকে নির্ধারণ করতে হবে এবং সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আদর্শ নিয়োগকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সরকার ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশসমূহের অধিকাংশই গ্রহণ করেন এবং এজন্য ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ভূমি সংস্কার বিধিমালা ১৯৮৪ এবং কৃষি শ্রমিক (নিম্নতম মজুরি) অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারীকৃত হয়। এতদ্ব্যতীত মহাজনী ঋণের কবল থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ঋণ সালিশী অধ্যাদেশ ১৯৮৮ও জারী করা হয়।

১৩. ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪

উক্ত অধ্যাদেশের প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নরূপ করা হয়ঃ–

(১) যিনি বা যার পরিবার ৬০ মানানসহ বিঘা অপেক্ষা অধিক কৃষি জমির অধিকারী আছেন এমন কোন মালিক হস্তান্তর, উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে নতুন কোন কৃষি জমি অধিগ্রহণ করবেন নাএবং যার বা যার পরিবারের ৬০ মানানসহ বিঘার কম জমি রয়েছে তিনি নতুন অধিগ্রহণে ৬০ মানানসহ বিঘার বেশী অধিকারী হতে পারবেন না।

(২) বেনামীভাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির লেন–দেন করা যাবে না।

(৩) পল্লী এলাকার মনিব কর্তৃক বাস্তু হিসাবে ব্যবহৃত কোন জমি কোন অফিসার, আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা আটক, ক্রোক, বাজেয়াপ্ত করণ বা বিক্রয়সহ সকল আইনগত প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি পাবে এবং এরূপ জমির মনিবকে কোন উপায়েই উক্ত জমি থেকে বঞ্চিত, বেদখল বা উচ্ছেদ করা যাবে না।

(৪) কোন বর্গাচুক্তি পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য বৈধ থাকবে।

(৫) বর্গাজমির উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ মনিব জমির জন্য গ্রহণ করবেন, বর্গাদার শ্রমের জন্য এক তৃতীয়াংশ নেবেন এবং মনিব বা বর্গাদার উভয়ে চাষের পরিব্যয়ের সমানুপাতে এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবেন।

১৪. ভূমি সংস্কার বিধিমালা ১৯৮৪

উক্ত বিধিমালা দ্বারা ভূমিসংস্কার অধ্যাদেশের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয় যথাঃ–

(১) অতিরিক্ত যেসব জমি সরকারের হাতে নিহিত হবে, সেক্ষেত্রে ৫০ বিঘা পর্যন্ত উক্ত জমির বাজার মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ হারে এবং তদূর্ধ জমি শতকরা ১০ ভাগ হারে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

(২) বর্গাচুক্তির জন্য 'চ' ফরম, বর্গাদারের মৃত্যুতে 'ঝ' ফরম, উৎপন্ন ফসলের ভাগের জন্য 'ট' ফরম নির্ধারিত হয়।

১৫. কৃষি শ্রমিক (নিম্নতম মজুরি) অধ্যাদেশ ১৯৮৪

উক্ত অধ্যাদেশ কৃষি শ্রমের মজুরীর নিম্নতম হার দিনপ্রতি ৩·২৭ কিলোগ্রাম চাউল অথবা স্থানীয় বাজারে ঐ পরিমাণ চাউলের দামের সমান পরিমাণ অর্থ হবে। এ নিয়ম অমান্য করা হলে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি মজুরী ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য গ্রাম্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন এবং দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পেতে পারবেন।

১৬. বাংলাদেশ ঋণ সালিশি অধ্যাদেশ—১৯৮৮

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নম্বর ৩৬) ১৯৮৮, ১৪ই এপ্রিল ১৯৮২ই অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ১৩৮৯ বাংলা তারিখ থেকে কার্যকর হয়। মহাজনী ঋণের কবল থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করা এর উদ্দেশ্য ছিল। মহাজনী ঋণ বলতে লিখিত বা মৌখিক চুক্তি বলে জামানতসহ বা জামানত ব্যতীরেকে টাকায় বা শস্যে বা শস্য বীজে পরিশোধযোগ্য এমন ঋণ বুঝায় যা টাকায় পরিশোধের ক্ষেত্রে আসল ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা বা তদুর্ধহারে পরিশোধ্য এবং শস্যে বা শস্য বীজে পরিশোধের ক্ষেত্রে আসল ঋণের উপর বার্ষিক এক পঞ্চমাংশ বা তদুর্ধ পরিমাণ অতিরিক্ত শস্য বা শস্যবীজসহ পরিশোধ্য। উক্ত অধ্যাদেশের ৪নং ধারায় বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি ঋণের জামানত হিসাবে কোন কৃষকের কাছ থেকে তার দস্তখত বা টিপসইযুক্ত অলিখিত ষ্ট্যাম্প কাগজ গ্রহণ করতে পারবেন না। ৫ নম্বর ধারা মতে কোন ব্যক্তি মহাজনী ঋণের শর্ত হিসাবে ঋণ গ্রহীতার জমির উৎপাদিত ফসল কোন প্রকারের অগ্রিম ক্রয় করতে পারবেন না বা তাঁর বাড়ীতে বা তাঁর নির্ধারিত কোন স্থানে উঠাতে পারবেন না।

উক্ত আইনের ৬নং ধারা মোতাবেক অনধিক ৫ একর জমির মালিক কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবনধারণে অক্ষমতা জনিত ও অসহায়তার কারণে কোন কৃষিজমি বিক্রয় করলে এবং উক্ত জমির বিক্রয়মূল্য অনধিক ৩০ হাজার টাকা হলে বা বিক্রীত জমির পরিমাণ অনধিক ১ একর হলে উক্ত কৃষক বোর্ড গঠিত হবার ৬ মাস বা বিক্রয় দলিল রেজিষ্ট্রী হবার ৬ মাস যেটা পরে হয় এর মধ্যে উক্ত বিক্রয়কে খাই খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করবার জন্য বোর্ডে দরখাস্ত করতে পারবে, এবং বোর্ড শুনানীর পর দরখাস্তের যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে উক্ত বিক্রয়কে ৭ বৎসর মেয়াদী খাই খালাসী-বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করবে। অনুরূপভাবে উক্ত আইনের ৭নং ধারা অনুযায়ী কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবনধারণে অক্ষমতা জনিত ও অসহায়তার কারণে অনধিক ৩০ হাজার টাকা মূল্যের কোন কৃষি জমি বা

অনধিক ১ একর পরিমাণ কৃষি জমি বিক্রয় করলে এবং উক্ত জমির বিক্রয়মূল্য বিক্রয়কালীন সমশ্রেণীর জমির প্রচলিত বাজার মূল্য থেকে বেশী হলে উক্ত কৃষক এ বিক্রয় বাতিল ঘোষণা করার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্ত করতে পারবেন।

মহাজনী ঋণ লাঘবকল্পে ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোন মহাজনী ঋণ গ্রহীতা তদকর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং এর উপর প্রদেয় সুদের ন্যায়সংগত হারও পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণের জন্য বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করলে বোর্ড গৃহীত ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং টাকায় পরিশোধ্য ঋণের ক্ষেত্রে অনধিক শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা হারে এবং শস্য বা শস্যবীজে পরিশোধ্য ঋণের ক্ষেত্রে আসল ঋণের বার্ষিক অনধিক এক পঞ্চমাংশ হারে সুদনির্ধারণকরবেন।

উক্ত আইনে একজন চেয়ারম্যান ও অন্যুন ২ এবং অনধিক ৪ সদস্য সমন্বয়ে ঋণ সালিসি বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলার অতিরিক্ত কালেক্টরের কাছে আপীলের ব্যবথা রাখা হয়। বোর্ড প্রদত্ত কোন আদশে অমান্য করলে অথবা বোর্ড বা আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে ভুল তথ্য প্রদান করলে অনধিক ৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ২ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডেরই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবে জেলা প্রশাসকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে এ ধারায় অভিযুক্ত করা যাবে না।

১৭. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৯১ এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৯১

প্রথম অধ্যাদেশ ১৯৯১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী জারীকৃত হয়। নদীগর্ভে বিলীন ভূমি ২০ বৎসরের মধ্যে জেগে উঠলে মালিক বা তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাৎক্ষণিকভাবে তা পূনর্দখল করতে পারবে বলে উক্ত অধ্যাদেশে বিধান রাখা হয় এবং এজন্য রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা সরকারকে প্রদান করতে হবে। তবে যদি মালিকের দখলে ইতিমধ্যেই ৬০ বিঘা জমি থাকে তাহলে ষাট বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের কাছে ন্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে ভাংগনের কারণে মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরাও খাজনা বা অংশবিশেষ থেকে ন্যায় সংগত ভাবে রেহাই পাবে। কিন্তু ৯ই মার্চ ১৯৯১ তে জারীকৃত উল্লিখিত দ্বিতীয় সংশোধনীতে প্রথম সংশোধনী এমনভাবে রহিত করা হয় যেন তা কখনও প্রণয়ন বা জারীকৃত হয়নি। [৯]

১৮. ভূমি জরীপ ব্যবস্থা

ভূমি মালিকানা ও ভূমি বন্দোবস্ত প্রধানতঃ ভূমি জরীপের উপর নির্ভরশীল। সরকার ১৯৮৮ সনে একটি ভূমি রেকর্ড ও জরীপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটি গঠন করেন। উক্ত

৯· দেখুন, Amendment of sec 86 of EBSAT Act under State Acquisition and Tenancy (Amendment) Ordinance, 1991 and State Acquisition and Tenancy (Second Amendment) Ordinance. 1991

কমিটি ১৯৮৯ সনের জুলাই মাসে তাদের প্রতিবেদন দেন। উক্ত কমিটি জরীপ ও খতিয়ান প্রণয়নের ১০টি ধাপ যথাঃ ট্রাভার্স সার্ভে, ক্যাডাষ্টাল সার্ভে, সীমানা চিহ্ন নির্মাণ, খানাপুরী, বুঝারত, তসদিক, খসড়া খতিয়ান প্রকাশনা, আপত্তি দাখিল ও নিষ্পত্তি, আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং খতিয়ান চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশনা চিহ্নিত করেন। ঐতিহাসিকভাবে ১৮৮৯ সন থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত যে জরীপ পরিচালিত হয়েছিল, তা ক্যাডাষ্টাল বা কিস্তোয়ার জরীপ নামে পরিচিত। অতঃপর ১৯৪৪ সনে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় সংশোধনী জরীপের কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জরীপের কাজ বন্ধ থাকে। অতঃপর ১৯৪৫ সনে ফরিদপুরে এবং ১৯৫২ সালে বরিশাল জেলায় সংশোধনী জরীপকাজ সমাপ্ত হয় এবং খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়। ক্যাডাষ্টাল সার্ভেকে সংক্ষেপে সি, এস জরীপ এবং সংশোধনী জরীপ বা রিভিশন্যাল সার্ভেকে সংক্ষেপে আর, এস জরীপ বলা হয়।

ট্রাভার্স সার্ভেতে মৌজার সীমানার চতুর্দিকে ও মৌজার অভ্যন্তরে কয়েকটি বাঁশের খুঁটি স্থাপন করতঃ খুঁটি সমূহের কোণ ও পারস্পরিক দূরত্ব প্রমাণ করা হয়। ক্যাডাষ্টাল সার্ভেতে বহুভূজ এলাকাকে সরেজমিনে সুবিধাজনকভাবে কযেকটি মোরব্বা বা চতুর্ভুজে বিভক্ত করা হয়। খানাপুরীতে ব্লুপ্রিন্টে প্রদর্শিত প্রত্যেক ভূমি খন্ডে উত্তর পশ্চিম কোন থেকে দাগ নম্বর দেয়া হয় এবং জমি মালিকের নাম, ঠিকানা, জমির শ্রেণী ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। বুঝারত পর্যায়ের প্রণীত খসড়া খতিয়ানের একটি কপি পূর্ব নির্ধারিত তারিখে স্থানীয়ভাবে ভূমি মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং তসদিক পর্যায়ে তথ্যগত কোন ভুল থাকলে বিনামূল্যে মালিক নির্ধারিত ফর্মে আপত্তি উপস্থাপন এবং তসদিক অফিসার কর্তৃক খতিয়ান সংশোধন করাতে পারেন।

মূল্যায়ন কমিটি জরীপ ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটির উল্লেখ করেন এবং কতিপয় নির্দিষ্ট সুপরিশ রাখেন। যথাঃ[১০]

(১) ভূমি মালিকের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তহশিল অফিসে ভূমি মালিকের মৃত্যুর রিপোর্ট ও দরখাস্ত দাখিল করেন তার বাধ্যতামূলক আইনগত বিধান করতেহবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক যাতে ভূমি মালিকদের মৃত্যুর ত্রৈমাসিক রিপোর্ট নিয়মিতভাবে তহশিল অফিসে সরবরাহ করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কার্যকর প্রশাসনিক তদারক এবং আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তহশিলদারগণ যাতে নামজারী সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(৪) রেজিষ্ট্রেশন আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাদি সংশোধনক্রমে রেজিষ্ট্রির জন্য নির্ধারিত ফরমে ভূমি হস্তান্তরের দলিল দাখিল করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৫) ভূমি হস্তান্তরের দলিল রেজিষ্ট্রী করার সময় আয়কর পরিশোধ সার্টিফিকেটের ন্যায় ভূমি রাজস্ব ও করাদি পরিশোধের দাখিল ব্যতীরেকে রেজিষ্ট্রি নামঞ্জুর করার বিধান করতে হবে।

১০· দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটি রিপোর্ট (জুলাই ১৯৮৯), পৃঃ ২১১–২১৪।

(৬) সরকারের খাস জমি বন্দোবস্তের নিয়মাদি পালন করতঃ উক্ত জমির বন্দোবস্ত চূড়ান্তকরণ এবং কবুলিয়ত ও পাট্টা সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে ও তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার সমূহ সংশোধন করতে হবে।

(৭) জেলা রেকর্ডরুম, রাজস্ব সার্কেল অপিস ও তহ্শিল অফিসে তামিল রেজিষ্টার নামীয় একটি রেজিষ্টার রাখতে হবে এবং তাতে উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বা আদালতের আদশে অনুসারে রেকর্ড সংশোধনের নোট রাখতে হবে।

(৮) জরুরী জাতীয় প্রয়োজনে ম্যাপের মত রেকর্ডও যাতে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোন স্থানীয় রেকর্ড রুমে রেকর্ড বিনষ্ট হলেও যাতে নির্ভারযোগ্য রেকর্ডের অভাব না ঘটে সেজন্য জরিপ মহা–পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় রেকর্ড রুম রাখতে হবে।

(৯) শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিকেন্দ্রীকরণের প্রশাসনিক নীতির খাতিরেই নয়, জনসাধারণের সুবিধা ও ঘনিষ্ট তদারকের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের কার্যকারিতা বিধানের স্বার্থেও বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও তত্ত্বাবধান দায়িত্ব পর্যাপ্তভাবে ন্যস্ত করতে হবে।

সরকার মুল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনা করেন এবং অধিকাংশ সুপরিশই বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের পথে রয়েছে।

১৯. ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রাধান্য

ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমি ব্যবস্থাপনাকেই কেন্দ্র করে এদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভূমি রাজস্ব নিশ্চিত করণ ও পরিদর্শনের জন্যই ১৭৬৯ সালে ইউরোপীয়ান সুপারভাইজার নিয়োগ করেন যা পরবর্তীতে কালেক্টার, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এন্ড কালেক্টার ও ডিপুটি কমিশনার নামে রূপন্তরিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব রেভিনিউ বোর্ড অব রেভিনিউ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিজ ঐতিহ্য সমুন্নত রেখেছে। ১৮২৯ সনে সৃষ্ট কমিশনার পদটিও প্রধানতঃ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায় ভিত্তিক ছিল। আজেকের দিনে ভূমি রাজস্ব বা ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের মোট রাজস্বের একটি নগণ্য অংশ মাত্র কিন্তু ভূমি প্রশাসন প্রশাসনের একটি বিরাট বিষয়। জরীপ কার্য সমাধাকরণ, জমিজমার রেকর্ড অব রাইট সংরক্ষণ, খাসজমি উদ্ধার, খাস জমি ও সায়েরাত মহলাদির বন্দোবস্ত প্রদান, চর এলাকার ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশুনা করণ, ওয়াক্ফ, দেবোত্তর, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের বিরাট দায়িত্ব।

যদিও তহ্শিল অফিসগুলি প্রধানতঃ ভূমি রাজস্ব ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায়কারী হিসাবে পরিচিত কিন্তু ঐ অপিস এবং ঐ উপরস্থ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিসকে অনেক পরোক্ষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। ১৯৮২ সালে গঠিত ভূমি সংস্কার কমিটি মন্তব্য করেন যে, গড়ে প্রতি দুই ইউনিয়নের জন্য একটি তহ্শিল অফিস আছে। ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত কার্যক্রম সফল করার জন্য দরকার হবে প্রতি ইউনিযনে একটি তহ্শিল বা অন্য কথায় গড়ে প্রতি কুড়িটি গ্রাম অর্থাৎ প্রায় ২২০০০ অধিবাসী বা ৪·৫ হাজার পরিবারের জন্য একটি তহ্শিল। তহ্শিলদারদের বিশেষ দায়িত্ব হবে (১) জমির

মালিকানা ও চাষ–স্বত্বমূলক সকল তথ্য খতিয়ানভুক্ত করণ, (২) ওয়ারিশ বা হস্তান্তর সূত্রে এসব মালিকানা ও চাষ–স্বত্বের বিধি শুদ্ধ ও অনুমোদিত পরিবর্তনের দ্রুত নথিভুক্তকরণ, (৩) মালিকানার সীমার ভিত্তিতে ভূমিভিত্তিক সকল প্রগতিশীল কর আরোপণের ও সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে কর্মকরণ, (৪) সকল অপত্তনযোগ্য খাসজমির রক্ষণাবেক্ষণ ও পত্তনযোগ্য খাসজমির যোগ্যতার ভিত্তিতে ভূমিহীন ও ভূমিস্বল্প চাষার অনুকূলে পত্তন প্রদান এবং (৫) কৃষি ঋণ সরবরাহকারী অর্থ–প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সরবরাহ করণ।[১১]

১৯১৩ সনের বোর্ড অব রেভিনিউ আইন অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদির তত্ত্বাবধান ও নিষ্পত্তি করণের প্রধান দায়িত্ব ছিল বোর্ড অব রেভিনিউ এর। একজন সিনিয়র মেম্বার এর প্রধান রূপে দায়িত্ব পালন করতেন। স্বাধীনতার পর বোর্ড অব রেভিনিউয়ের দায়িত্ব প্রথমে ভূমি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তীতে সরকার ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠন করেন। ভূমি আপীল বোর্ড (সংশোধন) আইন ১৯৯০ অনুযায়ী বোর্ডের কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি আদেশটি প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে তা পুনর্বিবের্চনার জন্য বোর্ডের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারবেন। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আপীল শোনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। বলাবাহুল্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিম বাংলা প্রদেশে পশ্চিম বংগ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৮১ এর আওতায় জেলা ভূমি সংস্কার অফিসার, মহকুমা ভূমি সংস্কার অফিসার ইত্যাদি ছাড়াও ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য সফল করণের জন্য ভূমি কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থাও রয়েছে।[১২]

সরকার ইতিমধ্যে ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা ও ভূমিউন্নয়ন কর এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে ভূমি প্রশাসন হয়তবা কিছুটা ভারমুক্ত হবে।

২০. উপসংহার

উপরের বর্ণিত আইনসমূহ ছাড়া আরও অনেক আইন রয়েছে সেগুলি প্রধানতঃ ভূমি কেন্দ্রিক যথাঃ ১৮৭৫ সনের সার্ভে আইন, ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর করণ আইন, ১৯০৮ সনের রেজিষ্ট্রেশন আইন, ১৮৮২ সনের পথাধিকার (Easement) আইন ইত্যাদি। মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। কাজেই বিভিন্ন আইনে সাধারণ মানুষের কতটা উপকার হচ্ছে, ভূমির উৎপাদনশীলতা কতটুকু বাড়ছে, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ কতটা কমছে, ভূমিহীন ও স্বল্প বিত্ত কৃষকের অবস্থার কতটুকু উন্নতি হচ্ছে– ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ধারায় সেটাই বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

---

১১. ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৩।

১২. Government of West Bengal "An outline of the functions of the Board of Revenue and Land & Land Reforms Department..... in the State of West Bengal" (Mimeo) (Undated), pp. 12-13.

গ্রন্থপঞ্জী

১. অজয় রায়, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাঃ সংকট ও সমাধান, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক্স্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৮৩

২. এমাজউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), ভূমি সংস্কার, ঢাকাঃ বুক সোসাইটি, ১৯৮২

৩. কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ঢাকাঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ১৯৮১

৪. মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া, ভূমি জরীপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ঢাকাঃ বই স্টলস, ১৯৯০

৫. সিরাজুল ইসলাম, ভূমি সংস্কার ও সমাজ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৮৩

৭. ঐ ভূমি রেকর্ড ও জরীপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট, ১৯৮৯

৮. Ismail, Muhammad, Land Laws of East Pakistan, Part I Dhaka : Progressive Publishers 1963

৯. Kabir, L. Land Laws in East Pakistan, Vol. I, II, III. Dhaka: Star Press, 1961

১০. West Bengal, Govt. of "An outline of the Functions of the Board of Revenue and Land & Land Reforms Department .....in the state of West Bengal" (Mimeo) (Undated).

১১. সৈয়দ তায়েফুল ইসলাম, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আইন, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ল' বুক সেন্টার ১৯৮৯।

প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো

ডঃ মোহাম্মদ তারেক

১.ভূমিকা

আজকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে দ্রুত আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন অর্জন এবং আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসরমান হ'বার জন্য প্রযুক্তি হচ্ছে বিনিশ্চায়ক কৌশলগত চালক। আধুনিক প্রযুক্তির এ অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা আমাদের সংবিধানে স্বাকৃতি পেয়েছে (বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ নং ১৫ ও ১৬)।

কিন্তু লক্ষ্যণীয়, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি–প্রকৌশল বা আর্থ–সামাজিক সাময়িকীগুলোতে এ সম্পর্কে খুবই কম সংখ্যক লেখা বা গবেষণা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ–

(ক) প্রথম দলে সেসব প্রবন্ধ ফেলা যায়, যে গুলোতে মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও এর যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (সর্বজনাব রেজা ও সামাদ, ১৯৮৩ ও জনাব নজরুল ইসলাম, ১৯৮৬)।

(খ) দ্বিতীয় দলের প্রবন্ধগুলোতে মূলতঃ আমদানীকৃত প্রযুক্তি যে নেতিবাচক প্রভাবগুলো ফেলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর, তার ওপর আলোচনা করা হয়েছে (জনাব রহমান, ১৯৮২, জনাব রায়, ১৯৮৭; জনাব আহমেদ ১৯৯৬।

আলোচিত প্রতিটি প্রবন্ধেই প্রযুক্তি হস্তান্তরের (Transfer of Technology) কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে আমরা যাঁরা উন্নয়নের পথে দেরীতে শরীক হয়েছি, তাঁদের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রশ্নটি অতীব জরুরী। তবে, বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা যা' চোখে পড়ছে, তা' থেকে দেখা যায়–প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রত্যয়টির অর্থগত

কাঠামো সম্পর্কে একটা গ্রহণযোগ্য যথাযথ সংজ্ঞা এখনও তৈরী না হলেও সংশ্লিষ্ট মহল এ সংক্রান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যৌক্তিকতার দিক থেকে দেখলে, সমাজ বিজ্ঞানে প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের যে কোন বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা শুরু করতে হলে 'প্রযুক্তি হস্তান্তর' প্রত্যয়টির একটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য অর্থগত কাঠামো বিনির্মাণের প্রয়োজন। প্রবন্ধটি সে লক্ষ্যে নিবেদিত। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় ভাগে 'প্রযুক্তি' প্রত্যয়টির বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞার একটা চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে একটি দেশের প্রাযুক্তিক–বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো বলতে কি বোঝায়, সেটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ ভাগে 'প্রযুক্তি হস্তান্তর' প্রত্যয়টির একটা অর্থগত কাঠামো নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে, পঞ্চম ও প্রবন্ধটির শেষভাগে বাংলাদেশের জন্য 'প্রযুক্তি হস্তান্তর' অর্থবহ করে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় দু'টি গবেষণা ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

২. *প্রযুক্তির সংজ্ঞা*

প্রযুক্তি হচ্ছে উৎপাদনের জন্য সংগঠিত জ্ঞান। এ সংগঠিত জ্ঞানের কাজ হচ্ছে উপকরণকে উৎপাদনে রূপান্তর করা।

প্রবাহ চিত্র ১

রূপান্তর প্রক্রিয়া

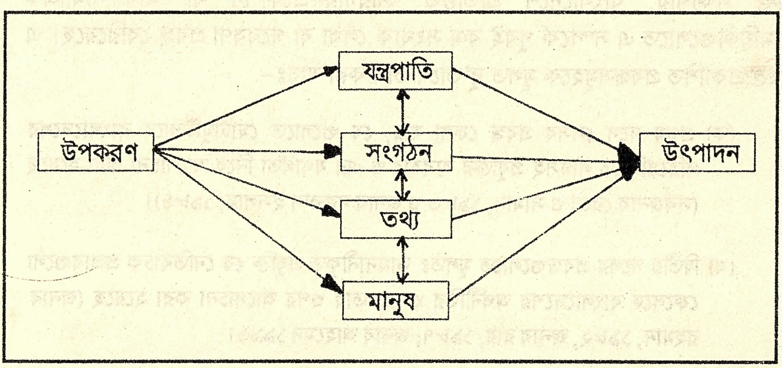

এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ চার ধরনের সংগঠিত জ্ঞান (প্রবাহ চিত্র ১) অত্যাবশ্যক। এ চার ধরনের জ্ঞানকে প্রযুক্তির চারটি মৌল উপাদান হিসেবে ধরা হয়ঃ কারিগরিশক্তি (Technoware), প্রাতিষ্ঠানিকশক্তি (Orgaware), তথ্যশক্তি (Infoware), এবং মানবশক্তি (Humanware) (ESCAP, ১৯৮৮)। তবে, মূল আলোচনাকে সহজতর ও

বোধগম্য করার লক্ষ্যে প্রবন্ধটির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে প্রযুক্তির মৌল উপাদানসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ– যন্ত্রশক্তি (Hardware যা' Technowar–এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হবে), কোমলশক্তি (Software যা' তথ্যশক্তিকে বুঝাবে) এবং মানবশক্তি (Humanware যা' মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি উভয়কেবুঝাবে)।

প্রযুক্তির প্রতিটি উপাদন অন্যান্য উপাদানের সাথে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া করে এবং সমষ্টিকভাবে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সাফল্যমন্ডিত করে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে–

অ। যে কোন রূপান্তরের অন্যতম সহায়ক যন্ত্রশক্তি। কিন্তু, এ যন্ত্রশক্তি প্রস্তুত, স্থাপিত ও চালিত হয় মানবশক্তি দ্বারা;

আ। মানবশক্তি যদিও রূপান্তর প্রক্রিয়ার চাবি, সে কোমল শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত;

ই। আবার এ কোমল শক্তি মানবশক্তি দ্বারা সৃজিত এবং যন্ত্রশক্তি চালাতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মানবশক্তি দ্বারা ব্যবহৃত।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, মানবশক্তিই হচ্ছে প্রযুক্তির মূলাধার। কিন্তু কোমলশক্তি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কিন্তু দুষ্পাপ্য পুঁজি। আজকের বিশ্বের ক্ষমতা সে দেশের হাতে যার হাতে কোমলশক্তির নিয়ন্ত্রণ।

নব্য–ধ্রুপদী অর্থনীতিতে প্রযুক্তিকে লোকদ্রব্য (Public Good) হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু, প্রকৃত পৃথিবীতে এটা একটা বাজারজাতযোগ্য দ্রব্য এবং মুনাফা অর্জনকারী। প্রযুক্তি বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে –অপ্রতিযোগিতা এবং ক্রেতা– বিক্রেতার মধ্যে তথ্যগত অসমতা। এটা অস্বীকার্য যে, যে ক্রেতার তথ্যগত অবস্থান যত ভালো তার পক্ষে প্রযুক্তির তত ভালো দাম পাওয়া সম্ভব এবং আমদানীকৃত বা ক্রয়কৃত প্রযুক্তি আত্মস্থকরণও তত সহজতর। যে কোন দেশের প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্যগত অবস্থান নির্ভর করে দেশটির প্রাযুক্তিক বৈজ্ঞানিক অবকাঠামোর ওপর।

৩. *প্রাযুক্তিক বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো (পবঅ)*

কোন দেশ স্বপ্রচেষ্টায় কতটুকু প্রযুক্তি সৃজন করতে পারে? তা'ও নির্ভর করে ঐ দেশের প্রাযুক্তিক–বৈজ্ঞানিক অবকাঠামোর (পবঅ) উপর। আর পবঅ গঠিত হয় তিনটি কাঠামোর সমন্বয়েঃ– (১) শিক্ষা–প্রশিক্ষণ কাঠামো (যা সরবরাহ করে মানবশক্তি অর্থাৎ দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা), (২) শিল্প কাঠামো। (যা' সরবরাহ করে যন্ত্রশক্তি) এবং (৩) বৈজ্ঞানিক কাঠামো (যা 'সরবরাহ করে কোমলশক্তি)।

প্রবাহ চিত্র ২
প্রাযুক্তিক বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো ও প্রযুক্তির সম্পর্ক

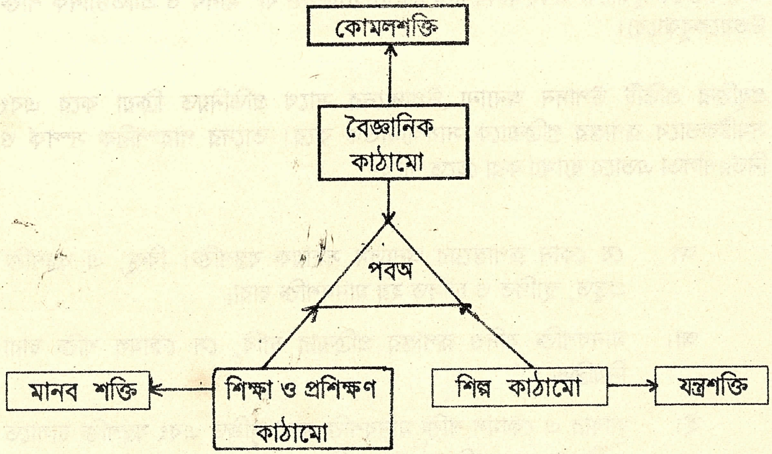

৪. *প্রযুক্তি হস্তান্তর*

প্রাযুক্তিকভাবে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশসমূহে উন্নয়ন কৌশলের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রযুক্তির আমদানী। প্রযুক্তির আমদানী প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করে না। সত্যিকার প্রযুক্তি হস্তান্তর তখনই ঘটবে, যখন আমদানীকৃত প্রযুক্তির উপদানমূহকে দেশীয়ভাবে আত্মস্থকরণ করা যাবে, অথবা দেশীয় পবঅ দ্বারা সেটাকে দেশোপযোগী করে অভিযোজিত রূপান্তর করা যাবে। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে– আমদানীকৃত প্রযুক্তির 'দেশীয় আত্মস্থকরণ' বা ' দেশোপযোগী অভিযোজিত রূপান্তর' বলতে কি বুঝায়? 'দেশীয় আত্মস্থকরণ' ও 'দেশোপেযোগী অভিযোজিত রূপান্তর' এ প্রত্যয় দু'টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যন্ত্র চালাবার ও রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা ও কাগিরি জ্ঞান হস্তান্তর হলেই প্রযুক্তির হস্তান্তর হবে না। বড় জোর এটাকে স্থবির হস্তান্তর বলা যায়। প্রযুক্তির গতিশীল হস্তান্তর তখনই সম্ভব যখন ক্রেতা/গ্রহীতা দেশে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ঘটবে যার মাধ্যমে সে আমদানীকৃত প্রযুক্তির কারিগরি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এবং নতুন সুবিধাদি প্রস্তুত করতে পারবে।

উপরোক্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটা মডেল নিম্নে খাড়া করা হলো। মনে করুন–

য = যন্ত্রশক্তি ম = মানবশক্তি ক = কোমলশক্তি	এবং	০ = বিদেশী ১ = দেশী

তা' হলে, $য^{০}ম^{০}ক^{০}$ দেখাবে একটি আমদানীকৃত প্রযুক্তি যার কোন উপাদানের দেশীয়করণ ঘটেনি। কোন দেশের ক্ষেত্রে এটি সত্যি হলে দেশটি প্রাযুক্তিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে, $য^{১}ম^{১}ক^{১}$ দেখায় প্রাযুক্তিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি দেশের প্রযুক্তি কাঠামো। সম্পূর্ণ নির্ভরশীল প্রাযুক্তিক কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রযুক্তির কাঠামোতে রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে অর্থাৎ–

$$য^{০}ম^{০}ক^{০} \longrightarrow য^{১}ম^{১}ক^{১}$$

এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটাকে নীচের মেট্রিক্স (Matrix) দ্বারা প্রকাশ করা যায় (সারণী ১)। এবং মেট্রিক্সটির জ্যামিতিক রূপ তুলে ধরা হয়েছে চিত্র ১ – এ। সারণী ১ অথবা চিত্র ১ অনুযায়ী প্রযুক্তি হস্তান্তরের সর্বমোট ৮ টি ধরন থাকতে পারে। সর্বানিম্ন ধরন বা স্তর হচ্ছে ছদ্ম হস্তান্তর। এখানো নতুন আমদানীকৃত প্রযুক্তিটির ওপর দেশটি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল

সারণী –১

প্রাযুক্তিক কাঠামো রূপান্তর মেট্রিক্স

যন্ত্রশক্তি	মানবশক্তি	কোমলশক্তি	
০	০	০	→ স্তর ১ → সম্পূর্ণ নির্ভরশীল
১	০	০	→ স্তর ২
০	১	০	→ স্তর ২
০	০	১	→ স্তর ২
১	১	০	→ স্তর৩
১	০	১	→ স্তর৩
০	১	১	→ স্তর৩
১	১	১	→ স্তর ৪ → সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা

প্রযুক্তি ↓ সময়

চিত্রঃ ১

প্রাযুক্তিক কাঠামো রূপান্তরের জ্যামিতিক রূপ

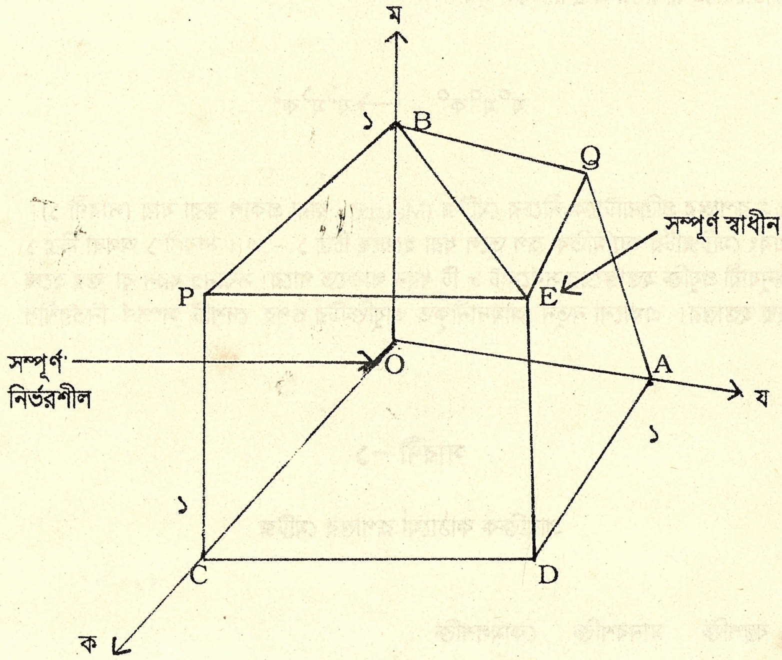

A, B,& C ⟶ কেবল মাত্র ১ টি উপাদানের দেশীয়ান ঘটেছে (২ য় স্তর)

P, Q,& D ⟶ দু'টি উপাদানের দেশীয়ান ঘটেছে (৩য় স্তর)

E ⟶ প্রতিটি উপাদানের দেশীয়ান ঘটেছে (চতুর্থ স্তর)

থাকছে। সর্বোচ্চ ধরন/স্তর হচ্ছে সম্পূর্ণ হস্তান্তর। এখানে দেশটি আমদানীকৃত প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে দেশীয়করণ বা আত্মস্থকরণ করতে পারছে। এ দু'টি মেরুঅবস্থানের মাঝে ৬টি মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রযুক্তি হস্তান্তর হতে পারে। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য চার ধরনের প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলোঃ–

ক। অভিযোজিত হস্তান্তর য^{0}ম^{0}ক^{0} $\rightarrow$ য^{1}ম^{1}ক^{0} চিত্রে বিন্দু Q দ্বারা চিহ্নিত)

বিদেশী প্রযুক্তি বছর ১– এ দেশে আনা হলো এবং ২য় বছর থেকে উৎপাদনে যাবার পূর্বে দেশীয় প্রাযুক্তিক বৈজ্ঞানিক কাঠামো দ্বারা যন্ত্রশক্তি অভিযোজিত হলো। এখানে

কোমলশক্তির দেশায়ন ঘটেনি। আমদানীকৃত যন্ত্রশক্তির পুনঃসৃজন ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাই, n তম বছরে প্রযুক্তিটি নিঃশেষিত।

চিত্রঃ ২ অভিযোজিত হস্তান্তর

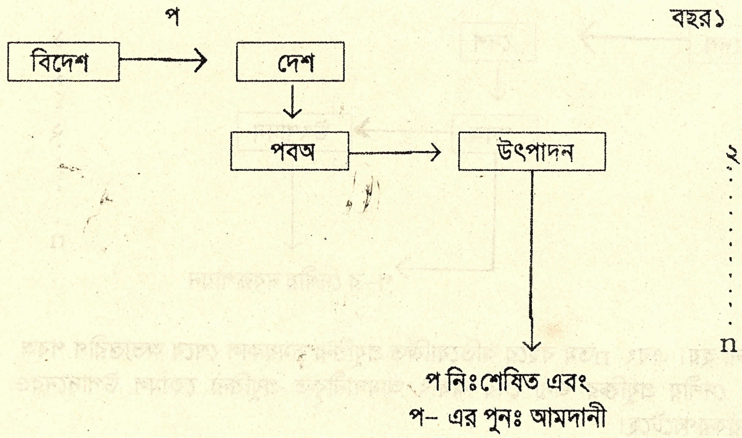

খ। সম্পূর্ণহস্তান্তর ঃ $য^0ম^0ক^0 \rightarrow য^0ম^1ক^0 \rightarrow য^1ম^1ক^1$ (চিত্রে E বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত)

চিত্র ঃ ৩ সম্পূর্ণ হস্তান্তর

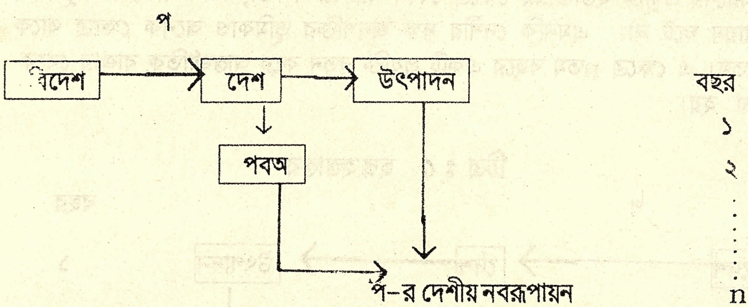

এখানে আমদানীকৃত প্রযুক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করার সাথে সাথে ১ম বছরই প্রযুক্তিটির ওপর গবেষণা করা শুরু হলো। nতম বছরে যখন চলতি প্রযুক্তির নবায়নের কথা, তখন অভ্যন্তরীণ পবঅ প্রযুক্তিটির নব রূপায়ন করে ফেলেছে। মানবশক্তির সাথে সাথে যন্ত্রপাতি ও কোমলশক্তির দেশীয়করণ ঘটেছে এখানে।

গ। সম্পূর্ণ অভিযোজিত হস্তান্তর ঃ $য^0ম^0ক^0 \rightarrow য^1ম^1ক^0 \rightarrow য^1ম^1ক^1$

এ ধরনের হস্তান্তর প্রক্রিয়া উপরোক্ত ক ও ঘ ধরনের হস্তান্তরের সমন্বয়। এখানে বছর ১–এ আমদানীকৃত প্রযুক্তি প দেশে আসার পর প্রযুক্তিটির অভিযোজন

চিত্র ঃ ৪ সম্পূর্ণ অভিযোজিত হস্তান্তর

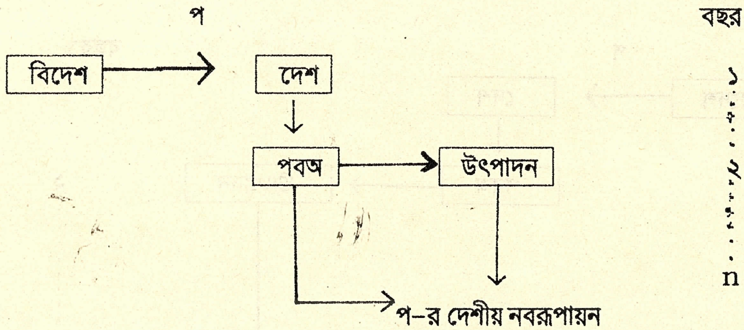

ঘটানো হয়। এবং nতম বছরে অভিযোজিত প্রযুক্তির সময়কাল শেষে অভ্যন্তরীণ পবঅ নতুন দেশীয় প্রযুক্তির জন্ম দেয় অর্থাৎ আমদানীকৃত প্রযুক্তির কোমল উপাদনেরও দেশীয়করণঘটেছে।

ঘ। ছদ্ম হস্তান্তর য^{0}ম^{0}ক^{0} $\longrightarrow$ য^{0}ম^{0}ক^{0}

এ ধরনের প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন ধরনের দক্ষতা, জ্ঞান বা ভৌত সুবিধার দেশায়ন ঘটে না। এমনকি দেশীয় দক্ষ জনশক্তির ভূমিকাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে ন্যূনতম। এ ক্ষেত্রে nতম বছরে একটি প্রযুক্তি নতুন করে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কেনা হয়।

চিত্র ঃ ৫ ছদ্ম হস্তান্তর

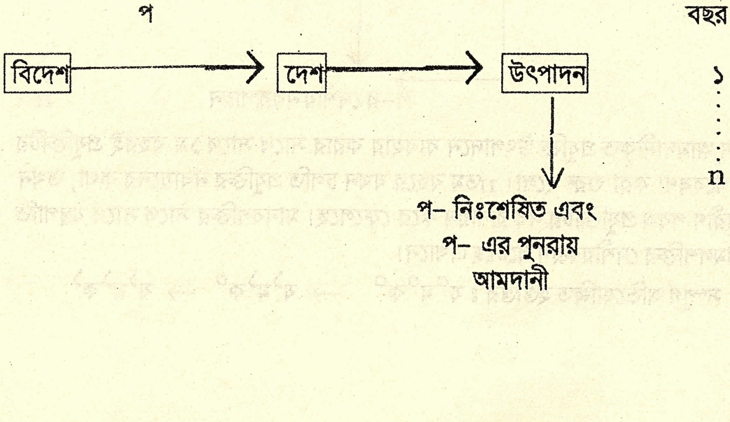

দুঃখের বিষয় অনুন্নত বিশ্বে যে সব প্রযুক্তি আসছে তার অধিকাংশই ছদ্ম-হস্তান্তর। যে কোন দেশের পছন্দের মাপকাঠি অনুযায়ী ঃ

স্বচেষ্টায় অর্জিত প্রযুক্তি > সম্পূর্ণ অভিযোজিত হস্তান্তরিত প্রযুক্তি >

সম্পূর্ণ হস্তান্তরিত প্রযুক্তি> অভিযোজিত হস্তান্তরিত প্রযুক্তি > ছদ্ম-হস্তান্তরিত প্রযুক্তি

তবে, অনুন্নত দেশের জন্য হয়ত স্বচেষ্টাসহ প্রতিটি প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, কোন দেশের পক্ষেই রাতারাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তবে, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং তাদের সুবিধা এবং দুর্বল দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণাথাকা।

৫. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্ট যে, যেকোন উন্নয়নশীল দেশের বিদ্যমান প্রাযুক্তিক বৈজ্ঞানিক কাঠামেরা মধ্যে প্রযুক্তি উন্নয়নের কৌশল নিম্নোক্ত বিষয়ে সুবিন্যস্ত নীতিমালা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল ঃ

অ। প্রযুক্তি আমদানীর ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রযুক্তি প্রাধান্য পাবে?

আ। সম্পূর্ণ প্রাযুক্তিক নির্ভরশীলতা থেকে প্রাযুক্তিক স্বাধীনতা অর্জনে কোন পথ অবলম্বন করা হবে?

ই। কোন নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জনের সময়সূচী কি হবে?

প্রযুক্তি হস্তান্তরের উপরোক্ত মডেল থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দেশীয় প্রাযুক্তিক বৈজ্ঞানিক আবকাঠামোর (পবঅ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনুন্নত দেশের পবঅ-এর বিকাশ কিভাবে করা যেতে পারে? এ ক্ষেত্রে আপাতঃ দৃষ্টিতে অনুন্নত দেশগুলোর তুলনামূলক সুবিধে নেই। কিন্তু সেটা স্থবির তুলনামূলক সুবিধের কথা। সচল তুলনামূলক সুবিধের দৃষ্টিতে অনুন্নত দেশের শিশু পবঅ-কে আগাতেই হবে। বাঁচাতেই হবে। এবং এটাকে কার্যকরী করার জন্য 'দক্ষিণ-দক্ষিণ' আলোচনার ওপর জোর দিতে হবে।

বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশসমূহকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ঋণাত্মক দিকগুলোর দিকে খেয়াল না করে বরং প্রাযুক্তিক পরিবেশের (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) অসম্পূর্ণতার দিকে এবং কিভাবে এসব অসম্পূর্ণতাসমূহকে কাটিয়ে ওঠা যায় সেদিকে নজর দেয়া অধিক প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আহমেদ, নাসিরউদ্দীন, ১৩৯৬ বাং ঃ উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বাস্তবতা, প্রশাসন সমীক্ষা, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৬, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি (ঢাকা ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ)।

৩. রহমান, আতিউর, ১৯৮২ বহুজাতিক করপোরেশন, পরনির্ভরতা এবং উন্নয়ন, সমাজ নিরীক্ষণ।

৪. রায়, জয়ন্ত কুমার, ১৯৮৭ , প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার কতিপয় দিক, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা–২৩।

৫. Asia and Pacific Centre for Transfer of Technology, 1986. Technology Policies and Planning Bangladesh India: Bangladesh.

৬. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 1988. An Overview of the Framework for Technology for Development, Draft 1211.

৭. Islam, M. Nazrul. 1986. The Processes of Technology Assessment and Technology Diffusion. Dhaka Institute of Appripriate Technology, Bangladesh University of Engineering and Technology.

৮. Reza, S. and Samad, S. A. 1986. Some Issues in Technology Transfer and Technology Policy or A ske ptical Note on Appropriate Technology, The Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 6, No. 2.

৯. Sachs, Ignacy. 1980. Studies in Political Economy of Development. Pergamon Press, Oxford, New York . . . . Frankfort.

১০. Schumacher E. F. 1975. Small is Beautiful, New York : Perennial Library.

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

নাসিরউদ্দীন আহমেদ

১.ভূমিকা

উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য সম্পদ আহরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এ দু' ধরনের উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়াতে হবে। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ প্রধানতঃ দুটো উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে ঃ (ক) কর রাজস্ব ও (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব। কোনরুপ প্রত্যক্ষ সুবিধার আশা না করে জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাকে কর বলে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের মোট রাজস্বের আশি ভাগেরও বেশী কর রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হয় সেহেতু নিবন্ধের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে কর রাজস্ব। কর আবার দু' প্রকার ঃ (১) প্রত্যক্ষ কর ও (২) পরোক্ষ কর। আয়কর, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করের দৃষ্টান্ত। আমদানীর ওপর শুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি পরোক্ষ কর।

১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রচলিত কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশে ১ লা জুলাই, ১৯৯১ থেকে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলাদেশের পরোক্ষ কর সংস্কার সাধনে মূল্য সংযোজন কর (Value added tax, সংক্ষেপে VAT)-এর উপযোগিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিবন্ধটিতে বাংলাদেশের কর কাঠামো, মূল্য সংযোজন করের বৈশিষ্ট্য, এ করের প্রভাব এবং বাংলাদেশে এ কর প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধটি কতিপয় পুস্তক ও প্রতিবেদন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর সেলে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

২. *বাংলাদেশের কর কাঠামো*

সারণী–১ এ বাংলাদেশের কর কাঠামো উপস্থাপিত হলোঃ

সারণী –১

বাংলাদেশের কর কাঠামো (১৯৮৫–৯০)

(কোটি টাকা)

কর	১৯৮৫–৮৬		১৯৮৬–৮৭		১৯৮৭–৮৮		১৯৮৮–৮৯		১৯৮৯–৯০		মোট (১৯৮৫–৯০)	
	পরিমাণ	শতকরা	পরিমাণ	শতকরা	পরিমাণ	শতকরা	পরিমাণ	শতকরা	পরিমাণ	শতকরা	পরিমাণ	শতকরা
১।পরোক্ষ	২,৬০২	৭৯	৩,০৩১	৭৮	৩,৪১৭	৭৮	৩,৭৯৬	৭৯	৪,৫৩৬	৭৯	১৭,৩৮২	৭৯
(এর মধ্যে)												
শুল্ক	১,৩৩৯	৪১	১,৫৪২	৪০	১,৬৫৪	৩৮	১,৮৪৫	৩৮	২,১৯৪	৩৮	৮,৫৯৪	৩৯
আবগারী	৭৭২	২৩	৯১৪	২৪	১,১৭২	২৭	১,৩৮৮	২৯	১,৭৩২	৩০	৫,৯৭৯	২৭
বিক্রয়	৪৬০	১৪	৫৩৯	১৪	৫৪৩	১২	৫০৪	১০	৫১২	৯	২,৫৫৮	১২
২।প্রত্যক্ষ	৭০১	২১	৮৩৮	২২	৯৫৪	২২	১,০২৭	২১	১,২৩৪	২১	৪,৭৫৪	২১
(এর মধ্যে)												
আয়	৪৬২	১৪	৫৫৩	১৪	৬৬৪	১৫	৭০৫	১৫	৮৭৫	১৫	৩,২৫৯	১৫
ভূমি উন্নয়ন	৫৫	২	৬৬	২	৭৬	২	৯২	২	১০৪	২	৩৮৯	২
মোট	৩,৩০৩	১০০	৩,৮৬৯	১০০	৪,৩৭১	১০০	৪,৮২৩	১০০	৫,৭৭০	১০০	২২,১৩৬	১০০

উৎস ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০–৯৫ (খসড়া), পৃষ্ঠা –৬।

সারণী –১ এ বাংলাদেশে পরোক্ষ করের প্রাধান্য (৭৯%) পরিলক্ষিত হয়। পরোক্ষ করের মধ্যে শুল্ক, আবগারী ও বিক্রয় কর উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের কর প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল। কর–জিডিপি অনুপাত ৭·৪% যা একই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশিষ্ট দেশের চেয়ে অনেক কম। বিদ্যমান কর কাঠামোর নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক ফলাফল লক্ষ্যণীয়ঃ প্রথমতঃ কর ব্যবস্থা জিডিপির সাথে অস্থিতিস্থাপক। জিডিপি ১·০০ টাকা বাড়লে কর রাজস্ব ০·৭১ টাকা বৃদ্ধি পায়। ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির পদক্ষেপ স্বেচ্ছানুসারে প্রতি বছর নেয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কর কাঠামো রপ্তানী– পরিপন্থী। কারণ আমদানী শুল্কের কার্যকর হার (৩৯%) অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান হার (৮%)– এর চেয়ে অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ বিদ্যমান কর কাঠামোতে উৎপাদন ও বিনিয়োগে দক্ষতা কাঁচামাল ও মূলধনী দ্রব্যাদির ওপর আরোপিত করের জন্য ব্যাহত হয়। মধ্যবর্তী দ্রব্যাদির ওপর আরোপিত করের পৌনঃপৌনিক প্রক্রিয়া রপ্তানী শিল্পকে নিরুৎসাহিত করে এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদকের উৎপাদন পছন্দ বিকৃত করে। এ ছাড়া কর কাঠামো অসম কারণ (ক) কৃষি আয়কে কর থেকে রেহাই এবং (খ) কর ছুটি ব্যক্তিগত আয় করের ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরায়। এ ধরনের কিছু সমস্যার সমাধান বিশেষ করে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলী সমাধানকল্পে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করা হয়েছে।[১]

৩. মূল্য সংযোজন করের স্বরূপ

৪০টি উন্নয়নশীল দেশসহ বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে কোন না কোন প্রকারের মূল্য সংযোজন কর প্রচলিত আছে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে কর সংস্কারের লক্ষ্যে যান্ত্রিক শিল্পসহ আমদানী স্তরে প্রাথমিক মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে।[২] মূল্য সংযোজন বলতে উৎপাদ মূল্য ও উৎপাদনের উপকরণ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝায়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় করদাতা একটি নির্ধারিত শতকরা হারে তার মোট উৎপাদ বিক্রয়ের ওপর উৎপাদ কর নির্ধারণ করে তাঁর ক্রয়কৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর বিয়োগ করে নীট অংশটুকু কর কর্তৃপক্ষের কাছে মূল্য সংযোজন কর হিসেবে প্রদান করবে। এই করের ভিত্তি হচ্ছে চূড়ান্ত পণ্য। উপরের ধারণাকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় ঃ

মূল্য সংযোজন = মোট উৎপাদ মূল্য – মোট উপকরণ মূল্য

মূল্য সংযোজন কর = কার হার x মোট উৎপাদ মূল্য

– কর হার x মোট উপকরণ মূল্য

= কর হার মূল্য সংযোজন

মূল্য সংযোজন কর গণনা পদ্ধতি 'পরিশিষ্ট–ক' এ সন্নিবেশিত হলো

৪. মূল্য সংযোজন করের বৈশিষ্ট্য

(১) মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি ব্যাপক। শুধুমাত্র প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং প্রক্রিয়াজাত অধিকাংশ দ্রব্যাদির ওপর বিদ্যমান আবগারী শুল্কের বদলে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া আমদানীর ওপর প্রচলিত বিক্রয় করের বদলে এই কর আরোপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্যাদি, পেট্রোলিয়াম, জ্বালানী তেল, লুব্রিক্যান্ট ইত্যাদি প্রচলিত আবগারী করের আওতাভুক্ত থাকবে।

(২) ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে শুধু মাত্র VAT এর একটি একক হার চালু করা হয়েছে যার হার ১০% থেকে ১৫%। বাংলাদেশেও এই নতুন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র একটি হার নির্ধারিত হয়েছে যা শতকরা ১৫ ভাগ।

(৩) পূর্বে কোন উৎপাদনকারীকে উৎপাদন উপকরণ ক্রয়ের সময় একবার এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময় আবার কর দিতে হতো। কিন্তু মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা দ্বৈত করের অবসান ঘটিয়ে কেবল উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়ের উপর ধার্য করা

১. পরিকল্পনা কমিশন ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০–৯৫, পৃষ্ঠা ।।।–২

২. The World Bank, Bangladesh : An Agenda for Tax Reform, Vol. I : Executive Summary and Overview, December 15, 1989, P. 15.

হয়েছে এবং উপকরণ ক্রয়ের সময় যে কর দেয়া হয় তা বাদ দিয়ে নীট অংশটুকু কর হিসেবে জমা দিতে হবে।

(৪) রপ্তানীকৃত চূড়ান্ত পণ্যে কোন কর আরোপ করা হবে না এবং রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করসহ অন্য সকল প্রকার কর ফেরত দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে রপ্তানীকারকদের উৎসাহ প্রদান করা হবে।

(৫) এই নতুন কর ব্যবস্থায় উপকরণ রেয়াতের জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রতিপরীক্ষা এবং কর ভার উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বন্টনের জন্য কর এড়ানোর সুযোগ কমে আসে। এ ব্যবস্থায় রেয়াত কার্যকর হবার প্রেক্ষিতে ক্রেতাগণ দলিলপত্র (বিক্রয় পুস্তক, ক্রয় পুস্তক ও চলতি হিসাব পুস্তক) সংরক্ষণের জন্য নিজে থেকেই সচেতন হয়ে ওঠবেন। প্রত্যেক করদাতা পরস্পর প্রতিপরীক্ষায় লিপ্ত হন, তাই কর এড়ানো এ কর ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে পড়ে।

(৬) যে সব ক্ষুদ্র আকারের শিল্প বা সেবা প্রদানকারী করারোপযোগ্য প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বিক্রয় দু'লাখ টাকার কম সে সব প্রতিষ্ঠানকে এ করের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করারোপযোগ্য কর্মকান্ড পরিচালনা করেন এবং যাদের বাৎসরিক টার্নওভার আইন বা বিধিমালা কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে, তাদেরকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বাধ্যতামূলক নিবন্ধণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত না হওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। এ কর ব্যবস্থায় প্রত্যেক করদাতাকে একটি নির্ধারিত ফরমে মাসিক দাখিল পত্র (মাসিক পরিশোধ ফরম) স্বীয় সার্কেল অফিসে জমা দিতে হবে। যদি কোন করদাতা যে কোন কারণে মাসিক দাখিল পত্র পরবর্তী মাসের ২০ দিনের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৫. মূল্য সংযোজন করের প্রভাব[৩]

মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনকারী সবগুলো দেশ প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। যেহেতু বাংলাদেশে এ কর সবেমাত্র চালু হয়েছে, সেহেতু এর প্রভাব নিয়ে কথা বলার সময় হয় নি। তবে অর্থনীতিতে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। উপাত্তের অভাবে এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা কঠিন কাজ। তবে কতিপয় উন্নয়শীল দেশ (যথা– ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন) যেখানে ইতিমধ্যে এই কর চালু করা হয়েছে সেখানকার অর্থনীতির ওপর এ করের কিছু সুনির্দিষ্ট প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) কর রাজস্ব ঃ ভারত সীমিত আকারে মূল্য সংযোজন কর (MODVAT) প্রবর্তন করা সত্ত্বেও প্রবর্তনের প্রথম বছরে এ করের আওতায় পণ্য সামগ্রী থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব

৩. এই অংশটি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রচিত ঃ মূল্য সংযোজন কর, বাংলাদেশ কর প্রতিনিধিদলের প্রতিবেদন, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪–৫।

পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব (১২·৩%) থেকে বেড়ে ২৮·৫%– এ উন্নীত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় এ কর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৪–৮৫ সালে এ দেশটিতে বিক্রয় কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল জিডিপির মাত্র ১%। মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের ফলে ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছরে জিডিপির ২·৯%– এ উন্নীত হয়। এ সব দেশে করের ব্যাপক ভিত্তি এবং দক্ষ প্রশাসন ও পরিচালনা পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তবে ফিলিপাইনে কর বাস্তবায়ন সমস্যার কারণে VAT চালুর প্রথম বছরে রাজস্ব আদায়ে কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

(খ) মূল্যস্তরের ওপর প্রভাবঃ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সাধারণতঃ মূল্য সংযোজন কর মূল্যস্তরে কোন বিরূপ প্রভাব অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না। ভারতে এই কর প্রবর্তনকালীন সময়ে মূল্যস্তরের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে এই কর বিপুল রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্তরে নাম মাত্র বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। অথচ দেশটির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতিবিদরা আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে VAT –এর রাজস্ব বৃদ্ধিমূলক প্রভাবের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। মূল্যস্তরের ওপর এ করের ইতিবাচক প্রভাবের দুটো কারণ রয়েছে ঃ (১) বিক্রয় করের পরিবর্তে VAT চালুকরণ ও (২) মুদ্রা সম্প্রসারণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসকরণ। ফিলিপাইনে এ কর প্রবর্তনের ফলে "ভোক্তার মূল্য সূচক" (Consumer price index) – এ সামান্য বৃদ্ধি (৭৬% থেকে ৮৮%) পরিলক্ষিত হয়। বিশেষজ্ঞগণ এজন্য অন্যান্য কারণ যথা– শিক্ষামূলক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের অভাব, বিক্রেতাগণ কর্তৃক করের সাথে সংগতি রেখে মূল্যস্তরে সামঞ্জস্য না আনা এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে অবৈধ ব্যবসায়ীদের ফায়দা লোটার প্রচেষ্টা ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। সর্বোপরি, ফিলিপাইনে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করার আগে থেকেই মূল্যস্তর উর্ধগামী ছিল।

(গ) রপ্তানীর ওপর প্রভাবঃ যদিও মূল্য সংযোজন করের সাথে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই, তথাপি এটা ধারণা করা হয় যে VAT প্রবর্তনকারী দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার বিস্ময়করভাবে বাড়ার জন্য রপ্তানী বাটা স্কীম ও VAT যৌথভাবে দায়ী। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে শূন্যহার প্রবর্তন এবং রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করসহ অন্য সকল কর ফেরত দেয়ার ফলে রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলদানে সমর্থ হবে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে যেমন ভারতের ক্ষেত্রে এই কর প্রবর্তনের পর রপ্তানী আয় ৪০% বেড়ে গিয়েছে। ফিলিপাইনের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি শতকরা ২০ ভাগ। ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৮৬–৮৯ সময়কালে জ্বালানী তেল ব্যতীত অন্যান্য পণ্য সামগ্রী রপ্তানী থেকে আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন ঃ কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

তাত্ত্বিকভাবে মূল্য সংযোজন কর অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা। কারণ এ কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে (১) বিদ্যমান সংকীর্ণ কর ভিত্তিকে ব্যাপককরণ করা সম্ভব, (২) কর পদ্ধতি সহজতর হয়, (৩) জিডিপির সাথে করকে স্থিতিস্থাপক করা যায়, (৪) রপ্তানীকে

উৎসাহ প্রদান এবং (৫) বিনিয়োগ ও উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। VAT পৃথিবীর যে সব দেশে চালু আছে সেখানে মিশ্র ফলাফল পাওয়া গেছে। সত্যিকার অর্থে, এ কর ব্যবস্থার সাফল্য–ব্যর্থতা এ সব দেশে VAT প্রয়োগের পূর্বশর্তগুলো বিরাজ করার ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের মত উন্নয়শীল দেশে VAT প্রবর্তনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

(১) যখন কোন দেশ বিদেশী সাহায্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয় (বাংলাদেশে এডিপির ৯০% এর বেশী বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল), তখন এ দেশটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। নির্ভরশীলতার ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে দাতা দেশগুলোর কাছে সমর্পণ করতে হয়। এটাকে জাষ্ট ফাল্যান্ড ও জে, আর, পার্কিনসন ‘ পরিচালন ফাঁক’ (Governance Gap) হিসেবে অভিহিত করেছেন। একটি উন্নয়নশীল দেশে নীতি নির্ধারণে বিদেশী শক্তির প্রভাব বিস্তারের ব্যপ্তি পরিমাপের জন্য ‘ পরিচালন ফাঁক’ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।[৪] আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অনেক সময় এ সব দেশের মৌলিক আর্থ–সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় না করেই তৈরী একই রকম সমাধান চাপিয়ে দিয়ে থাকে। যখন এ সব নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তখন তারা (আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো) এ সব দেশের সরকারকে অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ বলে আখ্যায়িত করে। পরিণামে দেশের জনগণ দুর্ভোগ পোহায়। তাই মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু করার আগে এর উপযোগিতা নিয়ে আরো পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যমান কর কাঠামোর ওপর ব্যাপক সমীক্ষা এবং উৎপাদন, বিনিয়োগ, ভোগ, রাজস্ব, মূল্যস্তর, রপ্তানী, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী তথা সমগ্র অর্থনীতির ওপর VAT এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।

(২) কোন কর ব্যবস্থার সাফল্য শুধুমাত্র উন্নত কর কাঠামো ও কর হারের ওপর নির্ভর করে না বরং কিভাবে কর বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো দুর্বল বাস্তবায়ন। VAT – এর সাফল্যও নির্ভর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থার ওপর। ফিলিপাইনে VAT চালু করার প্রথম বছর দুর্বল বাস্তবায়নের কারণে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থা চালু না করে VAT প্রবর্তন করার ফলে গুয়েতেমালায় বিপর্যয় এসেছিল ১৯৮৩ সালে যখন সে দেশে এই কর প্রথম চালু করা হয়।[৫]

(৩) VAT প্রবর্তনের অন্যতম যৌক্তিকতা হলো এ ব্যবস্থা প্রচলিত কর ব্যবস্থাকে সহজ করবে। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে কতিপয় পণ্য যথা তামাক জাতীয় পণ্য, পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য ইত্যাদিকে VAT এর আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। প্রশাসনিক কারণটি স্পষ্ট নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে সব পণ্য সামগ্রী ও সেবাকে VAT এ আওতায় আনা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হবে না তা কি করে বলা যায়?

৪· Just Faaland and J. R. Parkinson, Aid Conditionality-The Governance Gap (Dhaka: BIDS, January, 1989).P. 4.

৫· Omar Haider Chowdhury, Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95), A Paper presented at the Seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA, p. 13.

(৪) কর ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখা/বিভাগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা, দায়িত্বাবলী পুনর্বন্টন করা, অধিক জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন। কিভাবে এ পুনর্গঠন করতে হবে তার ওপর সমীক্ষা পরিচালিত হতে পারে।

(৫) নতুন কর ব্যবস্থা সার্থকভাবে প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে এ কর সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই করের উদ্দেশ্য, এর কাঠামো, গণনা পদ্ধতি, দলিলপত্র সংরক্ষণ ও আইনগত দিক সম্পর্কে কর দাতাদেরকে অবহিত করবেন।

(৬) উন্নত হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য VAT কে কম্পিউটারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ কম্পিউটারের সাহায্যে উপাত্ত ও তথ্যাদি সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও সুসংহতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৭) নতুন কর ব্যবস্থার সাথে মুদ্রানীতি, মুদ্রা বিনিময় হার নীতি ও বাণিজ্য নীতির সংগতি বিধান করতে হবে।

(৮) উন্নয়নশীল দেশের গণজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। 'কোমল রাষ্ট্র' বলে অভিহিত এ সব দেশে দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বজনপ্রীতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দুর্নীতি নির্মূল না করতে পারলে মূল্য সংযোজন কর অর্থহীন হয়ে যাবে।

(৯) পরিশেষে বলা যায় স্বনির্ভর উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান ভোগের পরিমাণ ব্যাপকভাবে ত্যাগ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। জনগণের কাছে একটি যথাযথ জবাবদিহির ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সম্ভব। কারণ উন্নয়ন হচ্ছে মূলতঃ একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব।

৭. উপসংহার

স্বনির্ভর উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর রাজস্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান কর ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন যথার্থ। এ কর প্রবর্তনকারী দেশসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ কর ব্যবস্থা চালু করার আগে কিছু প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে VAT – এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১. Chowdhury, Omar Haider, Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95), A Paper presented at the Seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA.

২. Chowdhury, Omar, Haider and and Mahabub Hossain, " Tax Structure of Bangladesh : An Overview ", The Bangladesh Development Studies, Vol. XVI, No.4, December, 1988.

৩. Faaland, Just and J. R. Parkinson, Aid Conditionality - The Governance Gap (Dhaka : BIDS, January, 1989)

৪. Government of the People's Republic of Bangladesh, The Fourth Five Year Plan 1990-95 (Draft) (Dhaka : Planning Commission, June, 1990).

৫. Haque, Wahidul and Sultan H. Rahman, An Optimal Macroeconomic Planning Model for the Bangladesh Economy : Strategies for Self-reliant Development (Dhaka : BIDS, 1988)

৬. Lewis, W. Arthur, " Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" in A. N. Agarwala and S. P. Singh (ed.). The Economics of Underdevelopment (New Delhi : Oxford University Press, 1982)

৭. Myrdal, Gunnar, Asian Drama (Vol. II) (London : The Penguin Press, 1968)

৮. Report of the Bangladesh Tax Mission, Value Added Tax, January, 1990

৯. The World Bank, Bangladesh : An Agenda for Tax Reform (in Three Volumes), December 15, 1989.

পরিশিষ্ট—ক

মূল্য সংযোজন কর গণনা পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর ধার্য প্রণালী নিম্নবর্নিত ছকের সাহায্যে দেখানো হলো। নিম্নোক্ত ছকে আমদানীকৃত উপকরণের মূল্য ১০০ টাকা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উৎপাদনকারীর উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য যথাক্রমে ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা ধরা হয়েছে। শতকরা ১৫ ভাগ হারে মূল্য সংযোজন করা ধার্য করা হয়েছে।

ক		খ		গ		ঘ
আমদানী পর্যায়		প্রথম উৎপাদনকারী		দ্বিতীয় উৎপাদনকারী		তৃতীয় উৎপাদনকারী
আমদানীকৃত উপকরণের নির্ধারিত মূল্য=১০০ টাকা; ** মূল্য সংযোজন কর = ১৫ টাকা		উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য = ৩০০ টাকা; মূল্য সংযোজন কর =৪৫ টাকা; প্রদত্ত নীট কর ৪৫ টাকা –১৫ টাকা = ৩০ টাকা		উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য= ৪০০ টাকা; মূল্য সংযোজন কর = ৬০ টাকা; প্রদত্ত নীট কর ৬০ টাকা – ৪৫ টাকা = ১৫ টাকা		উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য= ৫০০ টাকা; মূল্য সংযোজন কর = ৭৫ টাকা; প্রদত্ত নীট কর ৭৫ টাকা –৬০ টাকা = ১৫ টাকা
সরকারী রাজস্ব ১৫ টাকা	+	সরকারী রাজস্ব ৩০ টাকা	+	সরকারী রাজস্ব ১৫ টাকা	+	সরকারী রাজস্ব ১৫ টাকা ----------- মোট সরকারী রাজস্ব ৭৫ টাকা

** খরচ, বীমা ও মাসুল মূল্য (C.I.F) + আমদানী শুল্ক + উন্নয়ন সারচার্জ

জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত

এস, এম, আলী আক্কাস

১.ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ গত বিশ বছরে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে আসছে তার পরিণতি নিয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রায় শতকরা একশ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর উন্নয়ন তৎপরতা তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নের নতুন কৌশল নির্ধারণ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে বিগত দুই দশকে অনুসৃত উন্নয়ন তৎপরতার ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং অতি সংক্ষেপে তার কারণ উদঘাটনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদী দিক নির্দেশনার ধারণা ও মৌল প্রশ্নগুলি উথাপন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতীয় অর্থনীতির দিক নির্দেশনা প্রশ্নে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ এবং সেগুলির সুবিধা অসুবিধা যুক্তি সহকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. সত্তর ও আশির দশকে উন্নয়ন প্রয়াসের ফলাফলঃ

স্বল্প ও প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানি ভিত্তিক কৃষি প্রধান এই দেশের খাদ্য ঘাটতি মিটানো, রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন ও কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারী দাতা সংস্থা ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ ১ মার্চ ১৯৯১ পর্যন্ত ১১,১৭৬৬ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য ছিল এ সব সাহায্য কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু বাংলাদেশের গত দুই দশকের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

মাথাপিছু আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় নিম্ন আয়ের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আয় বন্টনের প্রশ্নটি বাদ দিলেও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার তার উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে পারছে না। বরং বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার স্তিমিত হয়ে আসছে।

২.১ জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঃ ১৯৭৩ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিহার ৫.৯% থেকে কমে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক মেয়াদে (১৯৮০–৮৫) ৩.৭% হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে (১৯৮৫–৯০) এ হার আরও কমে ৩.৪% এ দাঁড়ায় (সারণী–১)।

মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হারের গতি প্রকৃতির এই নিম্নমুখীনতা বহুলাংশে কৃষি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধিহারের গতিশীলতার উপর নির্ভর করে। কৃষির প্রবৃদ্ধির গড় হার স্বাধীনতার পর থেকে স্তিমিত হয়ে আসছে। ১৯৭৩–৮০ পর্যন্ত ৭ বছরে কৃষির গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬%। এটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ২.৭% এ নেমে আসে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষির গড় প্রবৃদ্ধি হার আরো নেমে ১.৭% দাঁড়ায়। অপর পক্ষে, শিল্পের গড় প্রবৃদ্ধি হার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৭৩–৮০ পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধির হার ১২.৭% থেকে নেমে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে মাত্র ৫.২% এ এসে দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে এ প্রবৃদ্ধি হার ৫.১% ছিল।১৯৮৯–৯০ সালের প্রবৃদ্ধি বাদ দিয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনার প্রথম চার বছরে শিল্পোৎপাদন প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল মাত্র ৪ দশমিক ২ ভাগ (সারণী – ১)। কৃষি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধিহারের এই নিম্ন মুখী প্রবণতা তাই মোট জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির উপর ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন পড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ ১৯৮৭–৮৮ সালের বন্যা পরিস্থিতি।

২.২ জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির পতনের কারণ সমুহঃ কৃষি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধিসহ মোট জাতীয় আয়ের গড় প্রবৃদ্ধি হারের নিম্নমুখী প্রবণতার মুল কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ ও তার অর্থায়ন উৎসে নিহিত। বিনিয়োগের মাত্রা উৎপাদন প্রবৃদ্ধির একটি প্রাথমিক নিয়ামক। ১৯৭৩–৭৪ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি দেশ তার জাতীয় আয়ের কত অংশ বিনিয়োগ করতে পারছে সেটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের সাথে বিনিয়োগের অনুপাতের ক্রমাগত হ্রাস বা বৃদ্ধি মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিহারের হ্রাসবৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব রাখে। আশির দশকের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিনেয়োগ তার জাতীয় আয়ের আনুপাতিক হারে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাত ১৯৮০–৮১ সালে ১৬% হতে নেমে ১৯৮৯–৯০ সালে ১১.২% ভাগে দাঁড়ায়। এর অর্থ এই যে, বর্ষ পরম্পরায় জাতীয় আয়ে ভোগের অংশ ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রাধান্য

সারণী–১

খাতওয়ারী মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) (১৯৭৯–৮০ মূল্যে)

(বিলিয়ন টাকা)

বৎসর	জিডিপি চলতি মূল্যে	জিডিপি ডিফ্লেটর	মূল্য পরিশীলিত জিডিপি ১৯৭৯–৮০ মূল্যে	জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার	কৃষি ১৯৭৯–৮০ মূল্যে	কৃষির প্রবৃদ্ধি	শিল্প ১৯৭৯–৮০ মূল্যে	শিল্পের প্রবৃদ্ধি
১৯৭২–৭৩	৪৫·১১	৩৩·৮	১৩৩·৪৬		৭৮·৩৭		১৩·৫০	
১৯৭৩–৭৪	৭১·০৯	৪৭·৫	১৪৯·৬৬	১২·১	৮৬·৫৬	১০·৪	১৫·৪৫	১৪·৪
১৯৭৪–৭৫	১২৫·৭৪	৮১·৩	১৫৫·৬৬	৪·০	৮৫·৬৯	–১·০	২১·৯৪	৪২·০
১৯৭৫–৭৬	১০৭·৪৬	৬১·৯	১৭৩·৬০	১১·৫	৯৫·৬৯	১১·৮	২২·৯৯	৪·৮
১৯৭৬–৭৭	১০৫·৩৬	৬০·০	১৭৫·৬০	১·১৫	৯২·৮০	–৩·০	২৪·৭২	৭·৫
১৯৭৭–৭৮	১৪৬·৩৭	৭৮·২	১৮৭·১৭	৬৬	১০০·৮১	৮৬	২৫·১১	২·০
১৯৭৮–৭৯	১৭২·৮২	৮৮·৪	১৯৫·৫০	৪·৪	৯৯·৩৪	–১·৫	৩০·৯৮	২২·৯
১৯৭৯–৮০	১৯৭·৯৮	১০০·০	১৯৭·৯৮	১·৩	৯৯·৫০	০·২	২৯·৪৯	–৪·৮
১৯৮০–৮১	২৩৩·২৬	১১০·৪	২১১·২৯	৬·৭	১০৪·৮২	৫·৩	৩১·৭১	৭·৫
১৯৮১–৮২	২৬৫·১৪	১২৪·৪	২১৩·১৩	০·১	১০৫·৮৭	১·০	৩২·৬৭	৩·২
১৯৮২–৮৩	২৮৮·৪২	১৩০৬	২২০·৮৪	৩৬	১১০৬৬	৪·৫	৩২·৮৭	০৬
১৯৮৩–৮৪	৩৪৯·৯২	১৫২·১	২৩০·০৬	৪·২	১১২·৪৩	১৬	৩৫·৬০	৮·৩
১৯৮৪–৮৫	৪১৬·৯৬	১৭৪·৮	২৩৮·৫৩	৩·৭	১১৩·৪৯	০·৯	৩৭·৮১	৬·২
১৯৮৫–৮৬	৪৬২·০১	১৮৫·০	২৪৯·৭৩	৪·৭	১১৮·০৭	৪·০	৩৮·৬৭	২·৩
১৯৮৬–৮৭	৫৩৯·১৭	২০৭·৮	২৫৯·৪৭	৩·৯	১১৮·২১	০	৪১·৪৫	৭·২
১৯৮৭–৮৮	৬০৩·৭৭	২২৮৬	২৬৪·৫৭	২·০	১১৬·৯৭	–১·০	৪৩·৫৯	৫·২
১৯৮৮–৮৯	৬৫৬·৪০	২৪৪·২১	২৬৮·৭৪	১·৬	১১৬·৮৭	–০·১	৪৪·৭৯	২·৭
১৯৮৯–৯০	৭৪৪·০০	২৬৩৬৪	২৮২·২০	৫·০	১২৩·২৮	৫·৫	৪৮·৪২	৮·১
গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি								
১৯৭৩–৮০				৫·৯		৩৬		১২·৭
১৯৮০–৮৫				৩·৭		২·৭		৫·২
১৯৮৫–৯০				৩·৪		১·৭		৫·১

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড টেবিল ১৯৮৯–৯০ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৯–৯০ থেকে রূপান্তরিত। ১৯৮৮–৮৯ ও ১৯৮৯–৯০ এর উপাত্তসমূহ ১৯৮৪–৮৫ এর মুল্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপে (১৯৮৯–৯০) উপস্থাপিত উপাত্তের ১৯৭৯–৮০ এর মুল্যে পরিবর্তিত রূপ।

পাচ্ছে। বিপরীত পক্ষে পুনরুৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের অংশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মোট জাতীয় উৎপাদনের গতিশীলতা বিনিয়োগ স্বল্পতায় দুর্বল হয়ে পড়ছে (সারণী-২)।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ ক্ষমতা পড়ে যাওয়ার কারণটি তার বিনিয়োগের অর্থায়ন উৎসে নিহিত। এটা সর্বজন বিদিত যে, বাংলাদেশের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে সামান্য এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে সিংহভাগ আসে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ক্ষমতা অত্যন্ত নিম্ন। ১৯৭৩-৮০, ১৯৮০-৮৫ ও ১৯৮৫-৯০ মেয়াদে এ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১·৬%, ১·৫% ও ২·৯%।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান মোতাবেক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। সেকারণে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্যই বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রাপ্তির বিকল্প ও প্রধানসূত্র (সারণী-২)।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ সরকারের রাজস্ব আয়ের চাইতে উচ্চহারে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি। রাজস্ব উদ্বৃত্তের হার সত্তরের দশকের শেষার্ধে বছরে গড়ে জাতীয় আয়ের ২৬ শতাংশ থেকে আশির দশকের শেষার্ধে ০৭ শতাংশে নেমে এসেছে। উন্নয়ন বাজেটের যে চলতি ব্যয় হয় তার হিসাব ধরলে সাম্প্রতিককালে সরকারী খাতে অবসঞ্চয় হচ্ছে বলা চলে।[১]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ক্ষমতা তার জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগের কম হলেও বিনিয়োগ করে এসেছে গত দশকে শতকরা ১০ ভাগ থেকে ১৫ ভাগ। অর্থাৎ বিনিয়োগের সিংহ ভাগই মিটে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। অন্যকথায় বলা যায়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ কতটা করতে পারবে সেটা মুলতঃ নির্ভর করে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণের উপর। অর্থাৎ বাংলাদেশের বিনিয়োগের নিয়ামক হলো বৈদেশিক সাহায্য। বৈদেশিক সাহায্যের উত্থানপতন তাই বাংলাদেশের বিনিয়োগের মাত্রাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। সত্তরের দশকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগ হারও বেড়েছে। বৈদেশিক সাহায্য -জিডিপি অনুপাত ১৯৭৩-৭৪ সালে ৫·২% থেকে বেড়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ৯·৬% হয়। একই সময়ে বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ৭·২% থেকে বেড়ে ১৫·১% হয়। কিন্তু ১৯৮১-৮২ সাল থেকে উভয় অনুপাতই হ্রাস পেতে থাকে। ঐ বছর বৈদেশিক সাহায্য-জিডিপি অনুপাত ৯·৪% থেকে কমে ১৯৮৯-৯০ সালে ৭·৮% এ নেমে আসে। একই সময়ে বিনিয়োগ -জিডিপি অনুপাত ১৫% থেকে ১১·২% এ হ্রাস পায় (সারণী-২)।

১। দৈনিক ইত্তেফাকঃ ৯ই এপ্রিল, ১৯৯১, ডঃ ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স রিপোর্ট।

সারণী– ২

বিনিয়োগ –জিডিপি, সঞ্চয়–জিডিপি ও বৈদেশিক সাহায্য–জিডিপি অনুপাত

(বিলিয়ন টাকা)

বৎসর	মোট দেশজ উৎপাদন চলতি মুল্যে	মোট বিনিয়োগ চলতি মুল্যে	বৈদেশিক সাহায্য চলতি মুল্যে	মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় চলতি মুল্যে	বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাত (%)	বৈদেশিক সাহায্য –জিডিপি অনুপাত (%)	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়–জিডিপি অনুপাত (%)
১৯৭৩–৭৪	৭১·০৯	৫·৪০	৩·৬৭	০·৪৩	৭·২	৫·২	০·৬
১৯৭৪–৭৫	১২৫·৭৪	৭·৮০	৮·০০	১·২৩	৬·২	৬·৪	১·০
১৯৭৫–৭৬	১০৭·৪৬	১০·৯৫	১১·৮৮	–৩·০১	১০·২	১১·০	–২·৮
১৯৭৬–৭৭	১০৫·৩৬	১২·৬৫	৮·২৭	৭·৩০	১২·০	৫·৬	৬·৯
১৯৭৭–৭৮	১৪৬·৩৭	১৭·০৫	১২·৬০	৩·১৮	১১·৬	৮·৬	২·২
১৯৭৮–৭৯	১৭২·৮২	১৯·৫১	১৫·৭০	২·৬৪	১১·৩	৯·১	৯·৪
১৯৭৯–৮০	১৯৭·৯৮	২৯·৮০	১৮·৯৩	৪·২৩	১৫·১	১·৬	২·১
১৯৮০–৮১	২৩৩·২৬	৩৭·২৩	১৮·৬৮	৭·৫০	১৬·০	৮·৩	৩·২
১৯৮১–৮২	২৬৫·১৪	৩৯·৮৪	২৪·৮৪	১·০২	১৫·০	১·৪	০·৪
১৯৮২–৮৩	২৮৮·৮২	৩৯·২১	২৭·৯৭	০·৮৮	১৩·৬	৯·৭	০·৩
১৯৮৩–৮৪	৩৪৯·৯২	৪২·৭৫	৩১·৬৫	৩·৮৭	১২·২	৯·০	১·১
১৯৮৪–৮৫	৪১৬·৯৬	৫২·০১	৩৩·০০	৯·৪৯	১২·৫	৭·৯	২·৩
১৯৮৫–৮৬	৪৬২·০১	৫৪·৬৮	৩৯·০৩	১১·২২	১১·৮	৮·৪	২·৪
১৯৮৬–৮৭	৫৩৯·১৭	৬৬·৮৬	৪৮·৮৬	১৮·৮৭	১২·৪	৯·১	৩·৫
১৯৮৭–৮৮	৬০৩·৭৭	৭১·৩৬	৫১·২৬	১৬·৪২	১১·৮	৮·৫	২·৭
১৯৮৮–৮৯	৬৫৬·৪০	৭০·৩৮	৫৩·৬৩	১৬·৬২	১০·৭	৮·২	২·৫
১৯৮৯–৯০ (আনুমানিক)	৭৪৪·০০	৮৩·২৭	৫৮·৪৫	২৭·৫০	১১·২	৭·৮	৩·৭
<u>গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি</u>							
১৯৭৩–৮০					১০·৫	৭·৯	১·৬
১৯৮০–৮৫					১৩·৯	৮·৯	১·৫
১৯৮৫–৯০					১১·৬	৮·৪	২·৯

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড টেবল, ১৯৮৯–৯০ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৯–৯০ থেকে রূপান্তরিত।

উপরোক্ত তথ্যানুসারে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ কমে আসছে যার প্রভাব বিনিয়োগের উপর সুস্পষ্ট। দেশে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ মন্দীভূত হওয়ার কারণ দু'টি ঃ এক, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ব্যবহার ক্ষমতা সম্পর্কে দাতাগোষ্ঠীর

সন্দেহ এবং দুই, পুর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবর্তনজনিত কারণে তথায় পশ্চিমা দেশগুলির বর্ধিত হারে সাহায্য দেয়ার আগ্রহ। তবে শেষোক্ত কারণটির কার্যকারিতা অতি সাম্প্রতিক কালের অর্থাৎ ১৯৮৯ সাল থেকে। সুতরাং ঋণের সদ্ব্যবহারে বাংলাদেশ দাতা দেশগুলির সামনে খুব একটা ভাল উদাহরণ রাখতে পারেনি।

বিনিয়োগ পড়ে যাওয়ার কারণ কেবলমাত্র জাতীয় আয়ের আনুপাতিক হারে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ সংকীর্ণ হয়ে আসাই নয়। যে অভ্যন্তরীণ কারণটি বিনিয়োগ হ্রাসের অন্যতম প্রধান নিয়ামকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সেটি হলো, দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহ কর্তৃক সত্তর ও আশির দশকে প্রদত্ত ঋণ আশানুরুপহারে সময়মত ফেরত না আসা এবং প্রদত্ত ঋণের একটা অংশ ক্রমবর্ধমানহারে তামাদি হয়ে যাওয়া। ফলে ব্যাংকের অধীনস্থ বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পুনঃসঞ্চালন হার ক্রমাগত পতনের সম্মুখীন। একটিগবেষণা ফলাফল[২] থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রদত্ত ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় তদারকির অভাবে বিশেষায়িত ঋণদান প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলির (সরকারী ও বেসরকারী) প্রদত্ত ঋণের একটা বড় অংশ তামাদি হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় বলা হয় ব্যাংক ঋণ তামাদি হওয়ার অন্যতম কারণ ঋণ গ্রহণকারী অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের রুগ্ন হয়ে পড়া। অনুসন্ধানে জানা যায়, ব্যাংক থেকে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অর্থ গ্রহণের পর ইচ্ছাপুর্বকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন ঘোষণার প্রবণতা অনেকাংশেই ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে কাজ করে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে গৃহীত ঋণের সুদ মওকুফ করে নেয়া এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেওলিয়া ঘোষণা করে ঋণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া।

৩. *দিক নির্দেশনার মৌল প্রশ্নঃ*

সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিহার স্তিমিত হওয়ার কারণ মুলতঃ তিনটিঃ (ক) অতি নিম্ন জাতীয় সঞ্চয় হার (খ) বৈদেশিক সাহায্য–জিডিপি অনুপাতের ক্রমবর্ধমান পতন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণযোগ্য অর্থের সঞ্চালন হার বৃদ্ধিতে অপারগতা। এক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতির দিক–নির্দেশনার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক, জাতি প্রায় সম্পূর্ণ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর প্রচলিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে কিনা? বিশেষ করে যখন বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হচ্ছে। জাতি বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারক্ষমতা বাড়িয়ে তার অন্তঃপ্রবাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন তৎপরতার ধারা অব্যাহত রাখবে নাকি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ–নির্ভর উন্নয়ন কর্মপ্রচেষ্টা শুরু করবে? সাহায্য গ্রহণ একেবারেই বন্ধ করে দিয়ে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর অত্যন্ত কঠিন উন্নয়ন কৌশলের ধারা গ্রহণ করবে? দুই, স্বল্প বৈদেশিক সাহায্য–নির্ভর অথবা বৈদেশিক সাহায্য–হীন উভয় পরাকৌশলই ইতমধ্যে সূচিত জাতীয় আয়ের মন্দীভূত প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবে যদি না অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও তা কাজে

---

২. আব্বাস, এস, এম, আলী "প্রচলিত ও লাভ–লোকসানে অংশ গ্রহণকারী ব্যাংক ব্যাবস্থার তুলনামুলক দক্ষতা অধ্যায়ন" শীর্ষক পিএই ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ (খসড়া), এপ্রিল, ১৯৯১।

লাগানোর বিকল্প এবং ফলপ্রসু পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব না হয়। সুতরাং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও স্বল্প বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন কৌশল এবং বৈদেশিক সাহায্যহীন কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় নির্ভর কর্মকৌশল–এদু'টির মধ্যে জাতি কোনটি বেছে নেবে? তিন, উপরোক্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যেটিই গ্রহণ করা হোক না কেন জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার স্তিমিত হয়ে পড়ার তৃতীয় কারণটি অপসারণ যে কোন অবস্থায়ই প্রয়োজনীয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিনিয়োগ ফলপ্রসু করতে না পারলে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর বা বৈদেশিক সাহায্যবিহীন অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় নির্ভর কোন কৌশলই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। অতীতের তুলনায় পুর্বোল্লিখিত যে কোন উন্নয়ন বিকল্পের অনুসরণ বাংলাদেশের জন্য অধিকতর ক্লেশদায়ক হবে। এমতাবস্থায় কষ্টার্জিত বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও সময়মত ফেরত আনার মাধ্যমে পুনঃসঞ্চালনের হার বৃদ্ধি করতে না পারলে কোন বিকল্পই সফল হবার নয়। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপার সরকার ব্যাংকের স্বাভাবিক ও নিয়ম মাফিক কর্মতৎপরতার উপর থেকে রাজনৈতিক প্রভাবের দুষ্ট প্রভাব ছিন্ন করবেন কিনা? ব্যাংক ব্যবস্থাপনার যাবতীয় স্তরে সরকার জওয়াবদিহীর ব্যবস্থা চালু করতে আগ্রহী কিনা। ঋণ গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যাংক কর্তৃক রোধের জন্য ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণ আইনগত ক্ষমতা দিতে সরকার রাজী কিনা? তৃতীয়টির জন্য প্রয়োজন আন্তরিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার যা কেবলমাত্র একটি জন প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছ থেকেই আশা করা যায়।

৪. দিক–নির্দেশনাঃ বিকল্প বাছাই

নিম্ন সঞ্চয় ক্ষমতার পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য উন্নয়ন বিকল্পের কোনটাই সহজ নাই। সহজ নয় এ অর্থে যে, স্বল্প পরিসম্পদ নিয়ে দুর্বল সম্পদ–সমাবেশ ক্ষমতা ও সম্পদ ব্যবহার কাঠামো এবং প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক দলীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে পুর্বে উল্লেখিত বিকল্পগুলির বাস্তবায়ন বাংলাদেশের চলমান আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেশ কঠিন। অত্যন্ত জীর্ণ কর ব্যবস্থাপনার কর ফাঁকি রোধ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও অন্যান্য উপায়ে সম্পদ সমাবেশের জন্য উদ্ভাবনী ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব না হলে দেশজ সম্পদ–নির্ভর উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ ঝুঁকিপুর্ণ। দেশজ সম্পদ নির্ভর উন্নয়ন কৌশল দু'রকম হতে পারে। এক, কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সমাবেশের মাধ্যমে তার উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। দুই, বিনিয়োগ–জিডিপির বর্তমান অনুপাত ঠিক রেখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের হার যতটা বৃদ্ধি করা যাবে সেই হারে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা পর্যায়ক্রমে কমানো যেতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় বিকল্পটি সম্ভবতঃ বেশী গ্রহণীয়। তবে এই একই কৌশল গত দুই দশকে অনুসৃত হয়েছে। বর্ধিত হারে বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিলে বৈদেশিক সাযায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ক্ষমতা এখন পর্যন্ত জাতীয় আয়ের শতকরা তিন ভাগের নীচে অবস্থান

করছে। সুতরাং কর ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের অন্যান্য উপায়ের যথোপযুক্ত প্রয়োগ ব্যতিরেকে শেষোক্ত কৌশলটিও অতীতের পুনঃসংস্করণ ছাড়া আর কিছুই হবে না। এজন্য কর ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্তকরণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকিং নর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে রাজনৈতিক প্রভাব স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির মত দুষ্ট ব্যাধি মুক্ত করার আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের জন্য কর ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার পাশাপাশি শুল্ক ফাঁকির ফাঁক–ফোকড় বন্ধ করার ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

দিক–নির্দেশনার ব্যাপারটি কেবলমাত্র উন্নয়নের অর্থায়ন উৎস বিবেচনার মধ্যেই সীমিত নয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা আরো দু'টি মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। সেগুলি হলো, জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়ানো বা অব্যাহত রাখা এবং দারিদ্র নিরসন। বাংলাদেশের জন্য প্রবৃদ্ধিহার বৃদ্ধির চাইতে এটাকে আশির দশকের গড় মাত্রায় ধরে রাখাটাই এখন প্রাথমিক করণীয়। সেটা করতে হলেও বিনিয়োগ–জিডিপি হারের পতন রোধ করতে হবে। আর এখানেই যথোপযুক্ত দিক–নির্দেশনা স্থির করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। বৈদেশিক সাহায্য সীমিত হয়ে পড়ার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ বাড়িয়ে তার ক্ষতি পুরণের সমস্যা। এটা পুর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানে যেটি যোগ করা যেতে পারে তাহলো, বৈদেশিক সাহায্যের স্বাভাবিক অন্তঃপ্রবাহ গ্রহণ করে নিলেও বাড়তি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের উদ্যোগ নিয়ে বিনিয়োগ হারের পতনরোধ সম্ভব কিনা? এটি সম্ভব কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে। এক,সঞ্চয়– জিডিপি হার এতটা বাড়তে হবে যাতে বিনিয়োগ–জিডিপি হার পতন থেকে রক্ষা পায়। দুই, বিনিয়োগকৃত অর্থের তুলনামুলকভাবে বেশী উৎপাদনশীল ও দ্রুত ফলপ্রদায়ক খাতে ব্যবহার। এক্ষেত্রেও বিবেচ্য হওয়া উচিত চালু ও নতুন প্রকল্পের মধ্যে দ্রুত ফলদায়ক উৎপাদনশীল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্ধের অগ্রাধিকার।৩

দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রথম করনীয় প্রবৃদ্ধিহারের পতন রোধ করা। সেটি কিভাবে সম্ভব ইতপুর্বে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় করণীয় হলো বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ অপেক্ষাকৃত চরম দারিদ্র ক্লিষ্টদের নিকট এমনভাবে পৌছানো যাতে সেটি প্রথম পর্যায়েই ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ব্যয় না হয়ে পুনরুৎপাদনে ব্যয় হয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এ জন্য অংশগ্রহণধর্মী বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রশাসন ও জনগণকে বাঞ্ছিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দারিদ্র ঠেকানোর জন্য শ্রম প্রধান প্রযুক্তি গ্রহণ একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীন শিল্প, গ্রামীন কর্মসংস্থান ইত্যাদি দারিদ্র নিরসণে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দারিদ্র নিরসণের অন্যতম উপায়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো উচ্চ বেকারত্ব হার পরিস্থিতিতে সীমিত সম্পদ কোন্ অর্থনৈতিক শ্রেণীর জন্য কতটা ব্যয় করা হবে? সীমিত সম্পদকে ভিত্তি করে গ্রহণ করার মত কোন সহজ কর্মকৌশল

৩. টাস্কফোর্স রিপোর্টে সরকারী খাতে সামগ্রীক বিনিয়োগ পরিকল্পনার দু'টি প্রধান সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলো প্রতিশ্রুত প্রকল্প সাহায্যের তুলনায় স্থানীয় মুদ্রায় সম্পদের ঘাটতি এবং সম্পদ সংস্থানের তুলনায় চলতি প্রকল্পের অত্যাধিক সংখ্যা। ফলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নতুন প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত মোট বাজেট বরাদ্ধের সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে।

এক্ষেত্রে নেই। সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান বেছে নেয়ার মত দক্ষতার উন্নয়ন, সরকার ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট বিরাজমান সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সেগুলি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। বিদেশে কর্মসুযোগ সন্ধান সরকারীভাবে জোরদার করা যেতে পারে এবং এতদুপলক্ষে বিদেশ গমনের সুযোগ সুবিধার দ্বার আরো উন্মোচন করা যেতে পারে।

৫.উপসংহারঃ

বিগত দুই দশকে অনুসৃত বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর উন্নয়ন কৌশল উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এটি জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তার পরিবর্তে জাতিকে আরও বেশি পরনির্ভরশীল করেছে। জাতি না অভ্যন্তরীণ সম্পদসমাবেশ ক্ষমতা বাড়াতে পেরেছে,না বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার ক্ষমতা প্রদর্শন করে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে জাতির সামনে উন্নয়ন কৌশল হিসেবে সহজ কোন বিকল্প খোলা নেই। রাষ্ট্রায়াত্তখাতের ক্রমবর্ধমান লোকসান, সংকীর্ণ কর ভিত্তি এবং দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ন কর-প্রশাসন অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ দুরুহ করে তুলেছে। অপর পক্ষে, বৈদেশিক সাহায্য তুলনামুলকভাবে কমে আসায় জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান অবস্থায় কেবল অভন্তরীণ সম্পদ নির্ভর অথবা সম্পুর্ণতঃ বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর উন্নয়ন কৌশল কোনটাই জাতীয় আয়ের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার পর্যায়ে নেই। এমনকি সীমিত অভ্যন্তরীণ সম্পদের এবং বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রধানতঃ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর যে উন্নয়ন কৌশল গৃহীত হয়ে আসছিল সেটিও ভবিষ্যতে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী গতি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

এমতাবস্থায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ জোরদার করার জন্য প্রশাসন,সেকটর করপোরেশনসহ সর্ব পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনুৎপাদনশীলতা বিদুরণ প্রশ্নে কঠোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এটি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ পরিস্থিতির উন্নতির বিধানের সাথে সাথে দেশের প্রতি দাতা দেশগুলির আস্থা ফিরিয়ে এনে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ বাড়তে সহায়তা করবে। স্বল্প মেয়াদে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা জোরদারের সাথে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কৌশল গ্রহণ জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী পতন ঠেকিয়ে রাখার জন্য জরুরী। তবে দীর্ঘমিয়াদী কৌশল হবে পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ নির্ভর উন্নয়ন কৌশলের দিকে যাত্রা করা। কৌশল হিসেবে এটি পুরাতন নিঃসন্দেহে। তবে কৌশলটির মুল অভ্যন্তরীণ সম্পদ-সমাবেশ প্রচেষ্টা জোরদার করার বিষয়টি গত দুই দশকে বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। এটির জন্য অকপট রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বপর্যায়ের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মত কর্মসুচী গ্রহণ করতে না পারলে অবস্থার কেবল পুনরাবৃত্তিইঘটবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. বিশ্বব্যাংকঃ বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট এনড শর্টটার্ম্য প্রস্পেক্টস, মার্চ ১৩,১৯৮৯ঃ এশিয়া কান্ট্রি ডিপার্টমেন্ট–১।

২. বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ার্ল্ড টেবল, ১৯৮৯–৯০।

৩. আতিক রহমান ও তৃণা হকঃ প্রভার্টি এন্ড ইন্ইক্যুয়ালিটি ইন বাংলাদেশ ইনদি এইটিজ এন এনালাইসিস অব সাম্ রিসেন্ট এভিডেন্স, ডিসেম্বর '৮৮, বিআইডিএস রিসার্চ রিপোর্ট নং– ৯১।

৪. এস, এম, আলী আক্কাসঃ বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্যনীতি –একটি সামগ্রীক পর্যালোচনা, প্রশাসনিক সমীক্ষা, ৩ য় বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৬।

৫. এস, এম, আলী আক্কাস ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসে বাণিজ্যনীতির ভুমিকা, প্রশাসন সাময়িকী, প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৭।

৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৯–৯০।

বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবহন খাতের ভুমিকাঃ একটি আলোচনা

হেলাল উদ্দিন আহমেদ

একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে পর্যাপ্ত ও কার্যকরী পরিবহন ব্যবস্থার উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল এবং উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দেশের যে একটি কাম্য পরিবহন ক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে এটা সর্বজনস্বীকৃত। পরিবহন ('মানব ও সম্পদের চলাচল') শুধুমাত্র নিজের খাতিরেই নয়, অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি বাহন হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। এ উদ্দেশ্যগুলোর কিছু হচ্ছে অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, কৃষি উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধি, অধিকতর হারে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, ভোগের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি। এরই পাশাপাশি আছে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী, রাজনৈতিক ঐক্য বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মজবুত করা, সমাজ অনুমোদিত পন্থায় ভৌগোলিক পরিমন্ডলের পরিবর্তন ইত্যাদি। স্পষ্টতঃই অর্থনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর দিক নির্দেশনা সব সময়ে এক নাও হতে পারে।

পরিবহন ব্যবস্থা–যাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক প্রগতির একটি ব্যারোমিটার হিসাবে কল্পনা করা যায়, তা ভৌগোলিকভাবে খন্ডিত পৃথিবীকে একটি একক রূপ দিয়েছে। আবিষ্কার ও মননের বাহন হিসাবে এটি নিঃসন্দেহে সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রভূত অবদান রেখেছে। পরিবহনের চাহিদা মানুষের কাছে ভোগ্য পণ্যের চাহিদার মতো মৌলিক নয়; এটি সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অংগ, সভ্যতার এক সুস্পষ্ট ইংগিত। পরিবহনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব আজ বিতর্কের উর্ধ্বে। পরিবহন শিল্প, যা ব্যক্তি ও বস্তুর স্থানান্তরের অধিক হয়তো তেমন কিছুই করে না, কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে শিল্প ও বাণিজ্যের সমগ্র অবয়ব আজ পরিবহনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই

দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিবহনের মাধ্যমেই মানুষ এই ভৌগোলিক বিছিন্নতা কাটিয়ে ওঠে এবং অবাধে সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করে বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করে। অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে কার্যকরী পরিবহন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রগতির অন্যতম শর্ত। উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, আহরণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই মানুষ কোন না কোন ভাবে পরিবহনের উপর নির্ভরশীল। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম বাহন হিসাবে পরিবহন খাতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা পৃথিবীর সকল দেশেই স্বীকৃত।

২. *বাংলাদেশের পরিবহন খাতঃ*

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে এমন খাতগুলোর মধ্যে পরিবহন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য পরিবহনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথাঃ-ঔপনিবেশিক আমল, পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়। ঔপনিবেশিক যুগে বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এছাড়া প্রশাসনিক সুবিধার জন্য স্থলপথ এবং জলপথের উন্নয়নেও হাত দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলে বিশেষতঃ রেলপথ এবং সড়ক যোগাযোগে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল এবং আকাশ পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়। মুলতঃ প্রাকস্বাধীনতাকালীন আমলে সৃষ্ট এই পরিবহন নেটওয়ার্কই স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের পরিবহন খাতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের পরিবহন খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এতে ভৌত অবকাঠামোর যেমন ক্ষতি হয় তেমনি লোকবল, প্রযুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যাপক লোকসান হয়। তাই নতুন স্বাধীন দেশে পরিবহন খাতের উন্নয়নের জন্য বিশেষ নজর দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পুর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তৎকালীন সরকারের সামাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবহন ব্যবস্থা মুলতঃ সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছে। তখন বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকায় বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল অত্যন্ত কম। এর প্রমাণ মেলে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবহন খাতে বেসরকারী অংশ গ্রহণের সুযোগ রাখা হয় মাত্র ১১%। পরবর্তীতে সরকারী বিধিনিষেধ উঠিয়ে নেয়ার ফলে বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এরমধ্যে বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে (যেটি পুর্বে বেসরকারী খাতের জন্য নিষিদ্ধ ছিল) বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বাংলাদেশের পরিবহন খাতে মোটামুটি ছয়টি উপখাত আছে। এগুলো হচ্ছে রেলপথ, অভ্যন্তরীণ নৌপথ, আন্তর্জাতিক নৌপথ, সড়ক যোগাযোগ, আকাশ পরিবহন এবং পাইপ

লাইন। এর মধ্যে আকাশ পরিবহন, পাইপ লাইন এবং রেলপথ সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং এগুলোতে বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণের সুযোগ নেই। অন্যান্য উপখাতে বেসরকারী খাত অংশ গ্রহণ করলেও অবকাঠামোগত দায়িত্বটি সরকারই পালন করে থাকে।

৩. রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দঃ

বাংলাদেশের পরিবহন খাতের জন্য ব্যয় বরাদ্দকে উন্নয়ন ব্যয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, এই দুই শ্রেণীতে বিভাজন করা যায়। এই দুই শ্রেণী একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়ন ব্যয় প্রধানতঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে দেয়া হয়। অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মূলতঃ দেশের রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। চাহিদার তুলনায় এই বরাদ্দ অত্যন্ত নগণ্য।

৪. মধ্যম মেয়াদী পরিকল্পনাঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩–৭৮) পরিবহন খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে ছিল– (ক) যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত পুনঃনির্মাণ ও ক্ষয়পূরণ, (খ) সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সরকারের আনুগত্য অক্ষুণ্ন রেখে পরিবহনের বিভিন্ন উপখাতে সরকারের অধিকতর অংশগ্রহণ। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮–৮০) প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল– (১) রেলওয়ে ও সড়কের পুনর্বাসন কার্যক্রম সমাপ্তিকরণ, (২) অগ্রসরমান প্রকল্পগুলো সমাপ্তিকরণ, (৩) বিভিন্ন পরিবহন উপখাতের কার্যকর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০–৮৫) এই খাতের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল– (১) অন্যান্য খাতের সহায়ক শক্তি হিসেবে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবহনের সুযোগ সুবিধা বিস্তৃত করা, (২) পল্লী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, (৩) সরকারী পরিবহন খাতের কার্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫–৯০) পরিবহন খাতে প্রধান লক্ষ্য ছিল– (১) উপজেলা সদর সমূহের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন সুযোগ সৃষ্টি করা, (২) বিরাজমান পরিবহন ক্ষমতার ব্যবহার পূর্ণাঙ্গভাবে করা, (৩) বিদ্যমান সুযোগ–সুবিধার যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

৫. সরকারী ব্যর্থতার কারণঃ

পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে উপর্যুপরি সরকারী ব্যর্থতার কারণ হিসেবে উল্লিখিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায়ঃ–(ক) সম্পদের অপর্যাপ্ততা (খ) কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (গ) পর্যাপ্ত পরিসংখ্যানের অভাব এবং (ঘ) অনর্থনৈতিক ও অবাণিজ্যিক প্রভাব।

৬. সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

বাংলাদেশের পরিবহন খাত বিশ্লেষণ করতে গেলে নিম্নেল্লিখিত সরকারী পরিবহন সংস্থাগুলো সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন– (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষ (৩) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্পোরেশন (৪)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (৫) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৬) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (৭) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (৮) বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন (৯) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এবং (১০) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

৭. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবহন খাত— আন্তঃ খাত সমন্বয় নীতির প্রতিফলনঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন খাতের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়। এই স্বীকৃতি কেবলমাত্র অর্থনীতির উৎপাদন ও বিতরণ খাতের চাহিদা প্রতিফলনকারীর নিষ্ক্রীয় ভূমিকার জন্য নয়, সম্ভাবনাময় উৎপাদনশীল ও অর্থনৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় ও প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকার জন্যও বটে। পরিবহন ব্যবস্থা পণ্য ও সেবার ভোগ, উৎপাদন ও বন্টনের গতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে এবং এভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজক হিসেবে কাজ করে।

সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার সহায়তা ছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিধৃত কৃষিজ ও শিল্পজ প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয় কারণ পরিবহণের মাধ্যমেই যথা সময়ে ও যথাস্থানে মানুষ ও বস্তু স্থাপন করা হয়। অনুরূপভাবে সামাজিক খাতের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সেবামূলক সুযোগ–সুবিধা প্রদানও সম্ভব হতো না যদি না যথাযথ পরিবহন অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকতো।

উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্রিয়া এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতকে প্রভাবিত করবে। এর ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য সমূহ, যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিশীল করা, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্য লাঘব ইত্যাদি অর্জনও সহজতর হবে।

অবশ্য এখাতে বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ রিটার্ণ পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হবে কারণ পূর্বতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গড়িয়ে আসা প্রকল্পগুলো এই খাতে বরাদ্দকৃত সম্পদের সিংহভাগ গ্রাস করবে। এই অবস্থা সংশোধনের জন্য পূর্বে শুরু করা প্রকল্পগুলোকে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে যতদূর সম্ভব ক্ষীণকায় করতে হবে যাতে নতুন উৎপাদনশীল প্রকল্প হাতে নেয়া যায়।

৮. উদ্দেশ্যাবলীঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে পরিবহন খাতের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে এর প্রধান লক্ষ্যসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। এই লক্ষ্য সমূহ হলোঃ– (ক) উৎপাদনশীল খাতের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে একটি যথোপযুক্ত পরিবহন অবকাঠামো সৃষ্টি করা (খ) নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের পুর্ণমাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত করা (গ) শহুরে এবং বিশেষতঃ নগর এলাকার পরিবহন ব্যবস্থার অসংগতি দূরীকরণ এবং ভূমি ব্যবহার ও

জল ব্যবস্থাপনার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ, (ঘ) পল্লী এলাকার অভ্যন্তরে গমনের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৯.কৌশলঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে পরিবহন খাত উন্নয়নে যে কৌশল অবলম্বন করা হবে সেগুলো হলোঃ– (ক) নতুন প্রকল্প সমূহের নির্বাচন কেবল অর্থনৈতিক বিবেচনার মানদন্ডে সীমাবদ্ধ রাখা (খ) কেবলমাত্র অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বর্তমান থাকা সাপেক্ষেই বিদ্যমান পরিবহন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, (গ) সামগ্রিক জল ব্যবস্থাপনানীতি ও কর্মসূচী এবং পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন যাতে পরস্পরবিরোধী না হয়ে একে অন্যের সম্পূরক হয় তা নিশ্চিত করণ, (ঘ) স্থল ও জল পরিবহনের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা (ঙ) আঞ্চলিক পরিবহন নেটওয়ার্কে ভারসাম্য আনয়ন (চ) ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনার সাথে পরিবহন নীতি ও কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন (ছ) বিদ্যমান পরিবহন সুযোগের দক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণ এটা সম্ভব আন্তঃমাধ্যম পরিবহন অর্থনীতি এবং বিদ্যমান পরিবহন কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ধর্মী নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে।

১০. বাংলাদেশের পরিবহন খাতে চিহ্নিত সমস্যাঃ

(ক) রেলওয়ে, সড়ক বা জল পরিবহন কর্পোরেশনের এর মতো সরকারী পরিবহন সংস্থাগুলোর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্য নির্বাহ করার কথা। কিন্তু এ সকল সংস্থা এমনকি নিজেদের অপারেটিং ব্যয় মেটানোর মতো প্রয়োজনীয় রাজস্ব সঞ্চারণ করে না। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে বর্ধিষ্ণু অপারেটিং ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে যাত্রী ও মাল ভাড়ার সমন্বয় সাধন করা হয়নি।

(খ) যেখানে বিদ্যমান সংস্থাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য সেখানে অতিরিক্ত সংখ্যক সড়ক নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া একেবারেই অযৌক্তিক। সড়ক নির্মাণের এই অতিরিক্ত চাপ থাকার ফলে রক্ষণাবেক্ষণের বরাদ্দ হ্রাস পায়। শুধু তাই নয়, চলমান প্রকল্পগুলোকেই এটা ব্যাহত করে।

(গ) যদিও বিধি অনুযায়ী সরকারের শুধুমাত্র সরকারী পরিবহন সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিষদের নিয়োগ এবং নীতিমালা বিষয়ক উপদেশ প্রদান করার কথা তবু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংস্থা সমূহের প্রধান নির্বাহীদের এমনকি কর্মচারী নিয়োগ ও ছাঁটাই এর ব্যাপারেও কোন ক্ষমতা নেই।

সারণী–১

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবহন খাতে সরকারী বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

	উপখাত	বরাদ্দ
(ক)	সড়ক ও সড়ক পরিবহনঃ	
	(১) সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৭৩০
	(২) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	২২৫৭
	(৩) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন	১০
	(৪) পরিকল্পনা কমিশন	৯
	মোটঃ	৪০০৬
(খ)	রেলওয়েঃ	
	(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে	৯৯৭
(গ)	জল পরিবহনঃ	
	(৬) চট্টগ্রাম বন্দর	৩৭৫
	(৭) মংলা বন্দর	৬০
	(৮) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষ	১৭০·১৮
	(৯) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্পোরেশন	২১৯·৮২
	(১০) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	২৫
	(১১) মেরিন একাডেমী	১১
	(১২) ডিপার্টমেন্ট অব শিপিং	১৬
	(১৩) ব্লক বরাদ্দ (কম্পিউটার ক্রয়)	১
	মোটঃ	৮৭৮
(ঘ)	আকাশ পরিবহনঃ	
	(১৪) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৩৯
	(১৫) বাংলাদেশ বিমান	১২০
	মোটঃ	৩৫৯
	সর্বমোটঃ	৬২৪০

সূত্র ঃ পরিকল্পনা কমিশন

সারণী–২

যাত্রী ও মাল পরিবহনের মাধ্যমভিত্তিক (যান্ত্রিক) বিভাজন (মিলিয়ন)

	১৯৮৯–৯০				১৯৯৪–৯৫			
মাধ্যম	মাল		যাত্রী		মাল		যাত্রী	
	টন–কিঃমিঃ	৴	যাত্রী কিঃমিঃ	৴	টন কিঃমি	৴	যাত্রী কিঃ মি	৴
রেল	৬৮০	১৩·২৫	৬৫৪০	১৯·০৩	৮৫০	১১·৭৫	৬৮৬৭	১৫·৭১
সড়ক	২৪৭৮	৪৮·২৮	২০৮৩৪	৬০·৬৩	৩৩৮২	৪৬·৭৭	২৮১২৬	৬৪·৩৩
আভ্যন্তরীণ জলপথ	১৯৭৪	৩৮·৪৭	৬৯৯০	২০·৩৪	৩০০০	৪১·৪৮	৮৭১১	১৯·৯৩
মোটঃ	৫১৩২	১০০·০০	৩৪৩৬৪	১০০·০০	৭৩৩২	১০০·০০	৪৩৭০৪	১০০৴

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশনের আনুমানিক হিসাব

(ঘ) সরকারী পরিবহন সংস্থাগুলো বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হবার কথা। কিন্তু প্রধান নির্বাহীর সরকার কর্তৃক প্রণীত বেতন কাঠামোর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। এই বেতনজনিত কারণে উপযুক্ত কর্মচারীদের অধিকাংশকেই ধরে রাখা সম্ভব হয়না।

(ঙ) সরকারী পরিবহন কর্পোরেশনগুলোর আর্থিক ক্ষমতাও এত সীমিত যে স্বায়ত্বশাসিত ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার সাথে তা খাপ খায় না। ক্রয়, ভাড়াবৃদ্ধি, ঋণ ইত্যাদির ব্যাপারেও সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিতে হয়।

(চ) যানবাহন ও জলযান চালনার ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো নিম্নরূপঃ–

(১) অবকাঠামোগত সুযোগ–সুবিধা দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত নিম্নমানের। নদীপথে ঠিকমত ড্রেজিং করা হয় না। এসকল কারণে যানবাহন চালনা ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপুর্ণ।

(২) বেসরকারী খাতে সহজ শর্তে বিনিয়োগের জন্য পুঁজির অভাব অত্যন্ত প্রকটভাবে অনুভূত হয়।

(৩) সড়কযানের অধিকাংশই আমদানী করা হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি দুষ্কর হয়ে পড়ে।

(৪) যাত্রী এবং মাল মভাড়া সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সরকার সাধারণতঃ চালনা ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি খুব একটা আমল দেয় না। ফলে মালিকরা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত যাত্রী বহন করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়েদেয়।

(৫) বাংলাদেশে বেসরকারী পরিবহন খাতের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দু'একটি যানের মালিকানা। এ কারণে এ খাতের পক্ষে সম্পদ যোগান দেয়া এবং বহর আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

(ছ) বাংলাদেশের পরিবহন অবকাঠামো কভারেজ এবং সেবার গুণগতমান উভয় দিক দিয়েই এখনো নীচুস্তরে। উদাহরণস্বরূপ প্রতি ২৫০ বর্গ কিলোমিটারে রয়েছ মাত্র ১৪·১৫ কিলোমিটার সড়ক এবং ৪·৮০ কিলোমিটার রেলপথ।

(জ) পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইটেমের জন্য আরোপিত কর ও শুল্ক কাঠামোর সমন্বয় প্রয়োজন– সমন্বয়ের প্রভাবের কথা স্মরণে রেখেই।

(ঝ) বর্তমান সম্পদ সমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে ক্রয় এবং নির্মাণের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা সকল পরিবহন উপখাত এবং বিশেষ করে রেল ও সড়ক উপখাতে অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

(ঞ) বাংলাদেশ রেলওয়ে মালামাল পরিবহনের পরিবর্তে যাত্রী পরিবহনের উপর অত্যধিক মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে সারাদেশে ট্রাফিক প্যাটার্ণে বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে সুষ্ঠু ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে মালামাল পরিবহনে রেলওয়ে ব্যর্থ হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রেলওয়ে পরিচালিত হবার কথা থাকলেও অর্থনৈতিক বিবেচনা কম থাকায় তা অলাভজনক হয়ে পড়েছে।

১১. সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সুপরিশ সমূহঃ

(১) সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে গেলে প্রকল্পের সংখ্যা, বিশেষ করে সড়ক প্রকল্পের সংখ্যা কমাতে হবে যাতে করে তা সম্পদের লভ্যতার সাথে খাপ খায়।

(২) উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের সময় এর অর্থনৈতিক সুফলের উপর নজর রাখতে হবে।

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে বর্তমানে যে বিভাজন রয়েছে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। পরিবহন পরিকল্পনা, যার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের দু'টি দিক রয়েছে তাকে এককভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে।

(৪) মন্ত্রণালয় সমূহের পরিকল্পনা কোষগুলোকে বিবিধ বিষয় ভিত্তিক গ্রুপ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে এগুলো প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী মুল্যায়নে সফল ও সক্ষম হয়।

(৫) রেলওয়েতে সুষ্ঠু বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনতে হলে নীতি নির্ধারণে পরিবর্তন প্রয়োজন যাতে করে মালামাল এবং যাত্রী সেবার মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়।

(৬) সরকারী পরিবহন সংস্থা সমূহের যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভাড়া তাদের অপারেশন ব্যয়ের চেয়ে কম। এটা শুধরানো প্রয়োজন যাতে করে অপারেশনের প্রকৃত ব্যয় এবং অতিরিক্ত সম্পদ খাটানোর প্রয়োজনীয়তা এতে প্রতিফলিত হয়।

(৭) পরিবহনের যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, পিওএল ইত্যাদির কর ও শুল্ক কাঠামোর পুনঃপরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রয়োজন যাতে করে এই কাঠামো বাস্তবসম্মত হয় এবং অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ সহজে করা যায়।

(৮) সরকারী পরিবহন সংস্থা সমূহে বর্তমান অপারেশনাল দক্ষতার নিম্নমানের জন্য জবাবদিহিতার অভাব একটি মুখ্য কারণ। স্বায়ত্বশাসিত পরিহন সংস্থা সমূহের বেতন কাঠামোকে আমালাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনাকে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে করে যোগ্য কর্মীদেরকে বহাল রাখা যায় এবং উৎসাহিত করা যায়।

(৯) বেসরকারী খাতে একটি বা দু'টি পরিবহনযানের মালিকানা অত্যন্ত প্রচলিত এর ফলে এই খাতের পক্ষে যানবাহনগুলোর আধুনিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেয়া সম্ভব হয়নি। তাই বৃহৎ আকারের কোম্পানী বা সমবায় সমিতি সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Jansen, Eric G., The Country Boats of Bangladesh, University Press Ltd. 1989.

২. Locklin, D. Philip, Economics of Transport, Richard D. Irwin Inc.

৩. Govt. of Bangladesh,
- (a) Planning Commission, Bangladesh Road Transport survey
- (b) Ministry of Finance, Economic Survey, 1977 to 1990
- (c) Planning commission, First Five year plan, Two year plan, Second Five year plan, Third Five year plan, Fourth Five year plan .
- (d) Planning commission, Country paper on Transport sector
- (e) Bangladesh Bureau of Statistics, statistical Pocket Book of Bangladesh, 1990.

৪. রহমান, মোঃ আতাউর, আধুনিক পরিবহন, জাহানারা বুক হাউস, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৮৩।

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন

গৌর সুন্দর বনিক

১.ভূমিকাঃ

যে-কোন কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা নিরূপণ এবং তার উন্নয়নে মূল্যায়ন অপরিহার্য। একটি প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রকল্প চক্রের ধাপে ধাপে মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণ অপরিহার্য তেমনি একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্থক বাস্তবায়নের জন্যও প্রশিক্ষণ চক্রের ধাপে ধাপে মূল্যায়ন অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন হচ্ছে প্রশিক্ষণ উন্নয়ণের মাপকাঠি বা মান নির্ধারক। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়; (ক) উপকরণ মূল্যায়ন (Input Evaluation) এবং (খ) উৎপাদ মূল্যায়ন (Output Evaluation)। উৎপাদ মূল্যায়নকে আবার প্রশিক্ষণ সাহিত্যে প্রধানতঃ চারটি স্তরে (Level) ভাগ করা হয়। এই স্তরগুলো হচ্ছে (ক) প্রতিক্রিয়া স্তর (The Reaction level) (খ) শিক্ষণ বা জ্ঞানাহরণ স্তর (Learning level) (গ) কর্মক্ষেত্রে আচরণ স্তর (The Job Behaviour level) ও (ঘ) দক্ষতা/সাংগঠনিক স্তর (The Functional level/ Efficiency and costs)।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মূলতঃ কেন্দ্র পরিচালিত বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে উপকরণ মূল্যায়ন ও উৎপাদ মূল্যায়নের প্রথমোক্ত দুটি স্তরকে অনুসরণ করে থাকে। উপকরণ মুল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া স্তরের মূল্যায়ন পদ্ধতিটি কেন্দ্র বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে দৈনন্দিন পরিবীক্ষণ, বক্তা মূল্যায়ন, পাঠ্যক্রম সমাপনী মৌখিক মুল্যায়ন ও পাঠ্যক্রম সমাপনী লিখিত মূল্যায়নের মাধ্যমে করে থাকে। পাঠ্যক্রমের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমের দৈনন্দিন অগ্রগতি সম্পর্কিত মতামত প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হওয়া এবং সেক্ষেত্রে সমাধানযোগ্য কোন বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেলে পাঠ্যক্রম প্রশাসনকে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করার উদ্দেশ্যেই এই

দৈনন্দিন পরিবীক্ষণ। অনুষদ ও অতিথি বক্তাদের বক্তব্যের সংগে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের সম্পৃক্ততা, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্বিকভাবে অধিবেশনের ফলপ্রসূতা নির্ণয়ের জন্য বক্তা মুল্যায়ন করা হয়ে থাকে। অনুষদ বক্তা মুল্যায়নের তথ্য অনুষদ উন্নয়নে ব্যবহার করা হয় আর অতিথি বক্তাদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মানের নিম্নে মান অর্জনকারীকে পরবর্তী পাঠ্যক্রমে প্রভাষণের জন্য আমন্ত্রণ না জানানোর সুপারিশ করা হয়। পাঠ্যক্রম সমাপনী মৌখিক মুল্যায়নে প্রশিক্ষণার্থীরা পাঠ্যক্রমের তাত্ত্বিক বিষয়াবলী, ডরমিটরী, ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরী, পাঠ্যক্রম প্রশাসন, শরীর চর্চা ও খেলাধুলা, মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রম, শিক্ষা সফর, অনুষদ ও অতিথি বক্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অনুষদের সম্মুখে তাঁদের মুক্ত মতামত প্রদান করে থাকেন। পাঠ্যক্রমের সার্বিক ফলপ্রসূতা নির্ণয় এবং ভবিষ্যতে পাঠ্যক্রমের উন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রম সমাপনী লিখিত মুল্যায়ন করা হয়।

অন্যদিকে শিক্ষণ/জ্ঞানাহরণ স্তরে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগীর কতটা উত্তরণ ঘটলো সেটা যাচাই করা হয়। বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা, টার্ম পেপার, গবেষণা প্রতিবেদন, মৌখিক উপস্থাপনা, শরীরচর্চা ও খেলাধূলা, শ্রেণীকক্ষ উপস্থিতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মেধা যাচাই করা হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের মুল্যায়ন পদ্ধতি কেন্দ্রের পক্ষে আপাততঃ অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের আহরিত জ্ঞান, দক্ষতা, পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগ করতে পারছেন কর্মক্ষেত্রে আচরণ স্তরে সেটি মুল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি কর্মকর্তাদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগী ও উন্নততর জ্ঞান-দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে ও জনগণের চাহিদা পূরণে কতখানি ভূমিকা পালন করছে এবং চূড়ান্তভাবে প্রশিক্ষণের একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করার কথা দক্ষতা স্তরে বলা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমতঃ প্রশিক্ষণ উপকরণ মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া স্তরের মুল্যায়নের মাধ্যমে আহরিত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের বিভিন্নমুখী মূল্যায়ন। দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যত বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন।

২. উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপাত্ত ব্যবহারঃ

এই প্রতিবেদনে যে সমস্ত উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো মূলতঃ চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যত বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের সময় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী কয়েকটি বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের উপাত্তও ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী কোর্সে ৮টি ক্যাডারের সর্বমোট ১৪৬ জন

কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ১৪৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১১৮ জন পুরুষ এবং ২৮ জন মহিলা কর্মকর্তা ছিলেন। দৈনন্দিন পরিবীক্ষণ ছক, বক্তা মূল্যায়ন ছক, মৌখিক মূল্যায়নে নির্ধারিত প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশিত তথ্য এবং পাঠ্যক্রম সমাপনী মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে এই উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতাঃ

প্রতিবেদনে চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়া স্তরের মাধ্যমে করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত অপর তিনটি স্তরের মাধ্যমে মূল্যায়নের কোন প্রচেষ্টা এখানে করা হয়নি। প্রতিক্রিয়া স্তরেও শুধুমাত্র প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট অনুষদের মতামত যাচাই করার কোন চেষ্টা এখানে করা হয়নি। মনে করা হয়েছে যে, বিভিন্ন অস্বাক্ষরিত মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠ্যক্রমটিকে মূল্যায়ন করেছেন। সংগে সংগে এটিও বলে নেওয়া ভাল যে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে অথবা শেষ হওয়ার সংগে সংগে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদত্ত বিভিন্ন উপাদনকে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষে কার্যকরভাবে মুল্যায়ন করা সহজসাধ্য কাজও নয়। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাক-প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ উত্তর পরীক্ষার মূল্যায়নের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে প্রতিটি পাঠ্যক্রমের শিক্ষণ/জ্ঞানাহরণ স্তরের সাফল্য পরিমাপ করা সম্ভব। তবে কেন্দ্র এখনো এ ব্যাপারে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়নি।

৪. প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

৪.১ তাত্ত্বিক পাঠ্যসূচীঃ বুনিয়াদী পাঠ্যসূচীর সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে তাত্ত্বিক বিষয়াবলী। অনেক প্রশিক্ষার্থীই কিছু তাত্ত্বিক অধিবেশন কমিয়ে ব্যবহারিক অধিবেশন যেমন প্রতি সপ্তাহে একটি করে মুক্ত আলোচনা, প্রবীণ প্রশাসকদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সচিবালয় পরিদর্শন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছেন।[১] বস্তুতঃ প্রশিক্ষার্থীদের ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে ব্যবহারিক দিক অবলোকন করার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ আছে কিন্তু তত্ত্ব জানার অবকাশ খুবই সীমিত। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিষয়ে অধিকতর আলোচনার সুবাদে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগিক বিষয়ের সংগে তা মিলিয়ে দেখার বা সমন্বয় সাধনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেজন্য তাত্ত্বিক বিষয় হঠাৎ করে কমিয়ে ফেলা যুক্তসংগত হবে না। তবে বিষয়টি একদিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এবং অন্যদিকে সময়ের স্বল্পতার কারণে "নবীনের মুখোমুখি প্রবীণ" শীর্ষক ২ ঘন্টা ব্যাপী একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই অধিবেশনে প্রশিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবের জন্য ৪/৫ জন দেশের প্রখ্যাত প্রবীণ প্রশাসক, নীতি প্রণেতা, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদও আইন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো যায়।

অপরদিকে পাঠ্যসূচীতে প্রশিক্ষার্থীরা কিছু নুতন তাত্ত্বিক বিষয় সংযোজনের সুপারিশ করে থাকেন। যেমন বাংলাদেশের পশু সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বাংলাদেশের রাজস্বনীতি,

---

১। দশম, দ্বাদশ ও চতুর্দশ বিশেষ বনিয়াদী পাঠ্যক্রমের বেশকিছু প্রশিক্ষণার্থীপাঠ্যক্রম সমাপনী মূল্যায়ন প্রশ্নমালার "কোর্সের সার্বিক উন্নয়নে পরামর্শ" ঘরে এই প্রস্তাব সমুহ উথাপন করেন।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব, বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা যুদ্ধ, কম্পিউটার প্রযুক্তি ইত্যাদি।[২] উপরোক্তসবগুলো বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও সময়ের স্বল্পতার কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনেক বিষয়ই পাঠ্যসুচীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি যদিও ইতিমধ্যে বেশকিছু অধিবেশন সন্নিবেশ করা হযেছে। তবে এক্ষণে সময়ের তাগিদে "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য" বিষয়ে একটি অধিবেশন অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করা যায়। বাংলাদেশের সম্পদ সমুহ মডিউলে মুলতঃ দেশের উন্নয়নে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ, ব্যবহার ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সুতরাং খনিজ সম্পদ বিষয়টিকে বন সম্পদের সংগে সংযোজিত করা যায়। এতে করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের এই সমস্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

সার্বিকভাবে তাত্ত্বিক পাঠ্যসুচী সম্পর্কে যা বলা যায় তা হলো এর ভীত অত্যন্ত সুসংবদ্ধ এবং দৃঢ়। এখন যা প্রয়োজন তা হলো যিনি প্রদান করবেন এবং যিনি গ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ। সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাব সব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত না হলেও সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু যোগাযোগ সর্বাধিক করার জন্যই একথা বলা। দাতা এবং গ্রহীতার উপরই এই সুষ্ঠু যোগাযোগ নির্ভর করেনা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশও এখানে বেশ প্রভাবশালী। এই পরিবেশ অনেকাংশে নির্ভর করে পাঠ্যক্রম প্রশাসনের উপর। একটি বিশাল দলকে প্রতিটি কার্যক্রমে সুকঠিন নিয়ম শৃংখলার মধ্যে বেঁধে রাখতে না পারলে যোগাযোগের এই প্রক্রিয়া হবে ব্যহত। জাতির ভবিষ্যত কর্নধার নবীণ প্রশাসকদের এই মুহুর্তে কোন শিথিলতা বরদাশত করা হলে প্রশিক্ষণের মূল দর্শন প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন এবং জনস্বার্থে রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নে তাঁরা সফল হতে পারেন না।

৪.২ অতাত্ত্বিক পাঠ্যসুচীঃ চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষার্থীরা বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে বেশকিছু অতাত্ত্বিক বিষয় সংযোজনের সুপারিশ করেছেন। ১৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১০৮ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ৭৪ ভাগ) এই বিষয়ে প্রস্তাব করেছেন। বাকী ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ২৬ ভাগ) এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব দেননি। ৫ জনের কম সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী যে বিষয়সমূহ প্রস্তাব করেছেন তা সারনীতে দেখানো হয়নি। এখানে এমনও দেখা গেছে যে, একই প্রশিক্ষনার্থী একাধিক বিষয় সংযোজনের প্রস্তাব দিয়েছেন। সারণী- ১ এ প্রস্তাবিত অত্যাত্ত্বিকবিষয়সমুহ সংযোজনের উদ্দেশ্যসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীই অধিকতর গোপনীয় কাজের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য মুদ্রাক্ষরণ প্রশিক্ষণ এবং জরুরী সরকারী কাজের প্রয়োজনে গাড়ী চালানো প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছেন। বস্তুতঃ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের যে মুল লক্ষ্য সুশীল সেবক হিসাবে স্বীয় দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন সেক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয় দুটির উপর প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দু'মাসের পাঠ্যক্রমে সেটা সম্ভব না হলেও

২। অষ্টম, নবম, দ্বাদশ ও চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের বেশ কিছু প্রশিক্ষণার্থী পাঠ্যক্রম সমাপনী মুল্যায়ন প্রশ্নমালার "কোর্সের সার্বিক উন্নয়নে পরামর্শ" ঘরে এই প্রস্তাবসমুহ উথাপন করেন।

সারণী—১

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে সংযোজনযোগ্য অতাত্ত্বিক বিষয়াবলী

সংযোজনের বিষয়	প্রস্তাবকারীর সংখ্যা	উদ্দেশ্য
(ক) টাইপ শিক্ষা	২০ *(১৯)	সরকারী কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য
(খ) গাড়ী চালনা	১৯ (১৮)	সরকারী জরুরী কাজ সমাধা করার জন্য
(গ) কম্পিউটার শিক্ষা	১৬ (১৫)	আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য
(ঘ) সাঁতার শিক্ষা	১৬ (১৫)	নদীমাতৃক দেশে সাঁতার শিক্ষারগরুত্ব অপরিসীম
(ঙ) আয়কর সম্পর্কিত ব্যবহারিকঅধিবেশন	১২ (১১)	আয়কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি সকলের জানাপ্রয়োজন।

* বন্ধনীর ভিতর মোট উত্তর দাতার শতকরা ভাগ বুঝানো হয়েছে।

ভবিষ্যতে ৪ মাস ব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য পাঠ্যক্রমগুলির প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এই সুযোগ প্রদান কেন্দ্রের দায়িত্ব। অনেক প্রশিক্ষণার্থী ইতিমধ্যে নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সাঁতার শিক্ষার প্রয়োজনীতার উপর গরুত্ব দিয়েছেন। সাঁতার না জানার ফলে গত দুটি বন্যায় কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তাকে দাপ্তরীক কাজ সম্পাদনার সময় জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। যা জাতির জন্য দুঃখজনক। একটি পাঠ্যক্রমে এই সাঁতার শিক্ষা শুরু হলেও আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন থেকে প্রতিটি পাঠ্যক্রমেই সাঁতার শিক্ষা শুরু করা উচিত।

৪.৩. শরীরচর্চা ও খেলাধুলাঃ শরীরচর্চা ও খেলাধুলা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য দিক। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জীবনে সুস্থ্যতা প্রাণোচ্ছলতা ও গতিময়তার ভীত গড়ার মানসেই এর প্রয়োজন। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও জীবনের একাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ করে জীবনকে সুস্থ, প্রাণময় ও গতিময় রাখার তাগিদে প্রত্যুষে যে বাধ্যতামুলক শরীরচর্চার ব্যবস্থা রয়েছে তাতে করে অনেকেই অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়েন শ্রেণীকক্ষে, ফলে প্রশিক্ষণের ছন্দ যায় কেটে। ছন্দ পতন সকলের ক্ষেত্রে না ঘটলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী এর শিকার হন। অবসন্ন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে চাংগা রাখার জন্য কৌশল হিসাবে অধিবেশনকে অধিকতর তথ্যপূর্ণ, বিশ্লেষণধর্মী ও প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে সর্বাধিক উপভোগ্য করার প্রয়াস নেওয়া প্রয়োজন।

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষণার্থীরা শরীরচর্চা ও খেলাধুলার উদ্দেশ্যকে অধিকতর কার্যকরী করার জন্য যে প্রস্তাবসমুহ প্রদান করেছেন সারণী –২ এ সেটা দেখা যাবে। ১৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১০১ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ৬৯ ভাগ) এই বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন। বাকী ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ৩১ ভাগ) এ বিষয়ে কোন উত্তর দেননি। ৫ জনের কম সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী যে বিষয় সমুহ প্রস্তাব করেছেন তা সারণীতে দেখানো হয়নি।

সারণী–২

শরীরচর্চা ও খেলাধুলা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রস্তাব সমুহ

প্রস্তাবসমুহ	প্রস্তাবকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(ক) ইনডোর গেমসের সুযোগ সুবিধা ও গেমসের সংখ্যা বাড়ানো	২০ *(২০)
(খ) খেলার মাঠ সমতল করা ও ঘাস সময় মত কেঁটে ফেলা	২০ (২০)
(গ) বৈকালিক খেলাধূলার জন্য সময় আরো বৃদ্ধি করা	১৯ (১৯)
(ঘ) শরীরচর্চা প্রশিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশিক্ষণাথীদের ছাত্র মনে করেন, এ ধরনের মানসিকতা বর্জন করা	১১ (১১)

* বন্ধনীর ভিতর মোট উত্তরদাতার শতকরা ভাগ বুঝানো হয়েছে।

বিকেলের খেলাধুলায় প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ অধিক বলে মনে হয়। অনেক প্রশিক্ষণার্থীই সারণী–২ এর তথ্য অনুসারে আউডোর খেলার সাথে সাথে বিভিন্ন ইনডোর খেলার বন্দোবস্ত করার কথা বলেছেন। অনেকে বিকেলে খেলাধুলার সময় বাড়ানোর দাবী জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের দাবী অনুসারেই জাতীয় পর্যায়ের এমন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি জিমনিসিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। খেলার মাঠ হৃদয়ের সখ্যতা স্থাপনের স্থান। সকলের হৃদয়ে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গড়ে তোলার জন্য শরীরচর্চা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণার্থীদের সংগে অধিকতর সহনশীলতা সহকারে অধিবেশন পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া যায়।

৪.৪. মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রমঃ দৈনন্দিন পরিবীক্ষণ, সমাপনী মৌখিক মুল্যায়ন এমনকি পাঠ্যক্রম সমাপনী লিখিত মুল্যায়নে অধিকাংশ প্রশিক্ষণাথী মৌখিক উপস্থাপনায় সভাপতির মূল্যায়নের মানদন্ড অভিন্ন হচ্ছে না বলে মতামত দিয়েছেন। প্রশিক্ষার্থীদের মতে মৌখিক উপস্থাপনা অধিবেশনের অনেক সভাপতি তাঁর মুল্যায়ন ভাষনে শুধুমাত্র সমালোচকের উপস্থাপনা কৌশল যেমন উচ্চারণ, অংগভংগি, আইকন্টাক্ট, ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেন। আবার অনেক সভাপতি শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। কোন কোন সময় অনেক সভাপতি দুটোর উপরও গরুত্ব দিয়ে থাকেন। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মুল্যায়নের মানদন্ড নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মৌখিক উপস্থাপনায় প্রাপ্ত নম্বর সমুহ বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন সভাপতি প্রদেয় নম্বরের রেঞ্জ এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন কোন সভাপতি প্রদেয় নম্বর নিম্নে ৭০ থেকে উর্দ্ধে ৯০ পর্যন্ত উঠানামা করে। আবার অন্য কোন সভাপতি প্রদেয় নম্বর ৫৫ থেকে ৭৫ পর্যন্ত উঠানামা করে। এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে যেটা ধরা পরে সেটা হলো কোন কোন সভাপতি একজন প্রশিক্ষণাথী ১০০ নম্বর পাবার যোগ্য ধরে নিয়ে তাঁর ভুল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার উপর নম্বর কর্তন করেন। আবার কোন কোন সভাপতি ৮০ নম্বর প্রাপ্তিকেই প্রশিক্ষণাথীর অসাধারণ কৃতিত্ব বলে মনে করেন।

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রমের মুল্যায়নকে সুষম করার জন্য একজন অনুষদের পরিবর্তে দুজন অনুষদকে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের প্রায় ৭০টি মৌখিক উপস্থাপনা অধিবেশনের মধ্যে মাত্র ৫টি অধিবেশনে দুজন অনুষদ সদস্যকে বিচারক হিসাবে পাওয়া গেছে। বিপিএটিসির মত শীর্ষ স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের লিখিত নীতিমালা ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এমন ফারাক প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট কেন্দ্রের ভাবমুর্তিকে ক্ষুন্ন করেছে বলে মনে হয়। অনুষদ সদস্যদের মধ্য থেকে দু'জনবিচারককে যদি কোন সংগত কারণে পাওয়া না যায় শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই আগের মত একজন বিচারকের নীতিমালা প্রযোজ্য হতে পারে। এদিকে কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অন্যদিকে মুল্যায়নের মানদন্ড সুষম করার ক্ষেত্রে বিচারকদের নিয়ে মুল্যায়ন অনুবিভাগ একটি ব্রিফিং অধিবেশনের আয়োজন করতে পারেন।

৪.৫. বক্তা মুল্যায়ন ঃ

সারণী– ৩

বিভিন্ন বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন সমুহের ফলপ্রসূতার শ্রেণী বিভাগ ভিত্তিক শতকরা অংশ

	বক্তার প্রকৃতি ও পরিচালিত অধিবেশনের শতাংশ							
ফলপ্রসূতার	অনুষদ বক্তা				অতিথি বক্তা			
শ্রেণী বিভাগ	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	চতুর্দশ	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	চতুর্দশ
৯০ ও তদুর্ধ্ব (অসাধারণ)	১·৮২	০·২৯	৪·৮১	২·৭০	১১·১১	৬·১৫	২২·৭২	১১·৭৬
৮০–৮৯ খুব ভাল	৪০·৭৩	৩২·০৮	৫৫·৭৭	৩৭·৮৪	৩৯·৬৮	৩০·৭৭	৫৪·৫৫	২৩·৫৩
৭০–৭৯ ভাল	৪৩·১৬	৫১·১৬	৩৬·৫৪	৪৮·৬৫	৪১·২৭	৪৭·৬৯	৯·০৯	৩৫·২৯
৬০–৬৯ গড়পড়তা	১৩·০৭	১৪·৭৪	২·৮৮	৭·২১	৩·১৭	১০·৭৭	৪·৫৫	২৩·৫২
৬০ এর নীচে নিম্নমান	১·২২	১·৭৩	--	৩·৬০	৪·৬২	৯·০৯	--	৫·৯
ফলপ্রসূতার গড়মান (%)	৭৭·৫২	৭৫·৯৮	৮১·১৩	৭৬·৯২	৭৮·৭১	৭৬·৫৮	৭৭·৯৫	৭৬·৫৩

সারণী–৩ এ প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী একাদশ, দ্বাদশ,ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের তুলনামুলক মুল্যায়নে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুষদ বক্তাদের ফলপ্রসুতার গড়মান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। কোন পাঠ্যক্রমে সামান্য বাড়ছে আবার কোন পাঠ্যক্রমে তা সামান্য কমছে। একাদশ ও দ্বাদশ কোর্সে অতিথি বক্তাদের ফলপ্রসুতার গড়মান অনুষদ বক্তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল হলেও ত্রয়োদশও চতুর্দশ পাঠ্যক্রমে অনুষদ বক্তারা অতিথি বক্তাদের চেয়ে কিছুটা হলেও বেশী পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সারণী–৪

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন সমুহের ফলপ্রসুতার শ্রেণী বিভাগ ভিত্তিক অধিবেশন ও বক্তার সংখ্যা

ফলপ্রসুতার শ্রেণী বিভাগ	অধিবেশনের সংখ্যা ও শতকরা ভাগ		বক্তার সংখ্যা ও শতকরা ভাগ	
	অনুষদ	অতিথি	অনুষদ *	অতিথি
৯০ ও তদুর্ধ্ব (অসাধারণ)	৩(২·৭০)	২(১১·৭৬)	৩	২(১১·৭৬)
৮০–৮৯ (খুব ভাল)	৪২(৩৭·৮৪)	৪(২৩·৫৩)	১৮	৪(২৩·৫৩)
৭০–৭৯ (ভাল)	৫৪(৪৮·৬৫)	৬(৩৫·২৯)	২৭	৬(৩৫·২৯)
৬০–৬৯ (গড় মান)	৮(৭·২১)	৪(২৩·৫২)	৬	৪(২৩·৫২)
৬০ এর নীচে (নিম্নমান)	৪(৩·৬০)	১(৫·৯)	১	১(৫·৯)
মোট	১১১(১০০)	১৭(১০০)		১৭(১০০)

* একই অনুষদ বক্তা ফলপ্রসুতার একাধিক শ্রেণীবিভাগে পড়েছেন।

সারণী–৪ এ স্পষ্টতঃই লক্ষ্যণীয় যে অনুষদ বক্তা কর্তৃক পরিচালিত অধিবেশন সমুহের মধ্যে ৬০–৬৯ শতাংশ ফলপ্রসুতা অর্জন করেছেন এমন অধিবেশনের সংখ্যা ৮ এবং সংশ্লিষ্ট বক্তার সংখ্যা ৬ জন। আবার ৪টি অধিবেশনে ১জন বক্তা ৬০ ভাগের নীচে ফলপ্রসুতা অর্জন করেছেন। অপর পক্ষে অতিথি বক্তা কর্তৃক পরিচালিত অধিবেশন সমুহের মধ্যে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ অধিবেশনে ৫ জন বক্তা ৭০ এর নীচে ফলসুতা অর্জন করেছেন। অনুষদ বক্তাদের মধ্যে যাঁরা ৭০ শতাংশের নীচে ফলপ্রসুতা অর্জন করেছেন তাঁরা ভবিষ্যতে যাতে ভাল করতে পারেন সে ব্যাপারে তৎপর হওয়ার জন্য তাঁদেরকে নির্দেশনা দেওয়া যায়। অনুষদ বক্তারা তাঁদের বক্তব্যের মানের অধিকতর উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যপরিচালন পর্ষদের সাহায্য নিতে পারেন এবং কেন্দ্রের টিওটি পাঠ্যক্রম অনুষদ বক্তাদের বিষয় ভিত্তিক উন্নয়নে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারেন। অধিবেশনে অধিকতর ফলপ্রসুতা অর্জনের জন্য বক্তাদেরকে আরো কিছু পরামর্শ দেওয়া যায়। যেমন দু'টি অধিবেশনের মাঝে প্রশিক্ষণাথীদের জন্য বিরতির সময় মাত্র ১৫ মিনিট। অন্য একটি অধিবেশনে বসবার আগে এই ১৫ মিনিট সময় প্রশিক্ষণাথীদের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ন। নির্ধারিত সময়ে অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের উপর যেমন কঠোরতা আরোপ করা হয়, নির্ধারিত সময়ে অধিবেশন শুরুর ব্যাপারে অনুষদ সদস্যদেরও তেমন দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অনুষদ সদস্যদের পক্ষে সামান্যতম ব্যত্যয় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে উক্ত অনুষদ সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। অনুষদ বক্তারা যে হ্যান্ডআউট/লেকচার নোট প্রশিক্ষণাথীদের প্রদান করে থাকেন তাতে টাইপিং এর স্বচ্ছতা, বানান, ভাষা ইত্যাদির ব্যাপারেও তাঁদেরকে অধিকতর যত্নবান হতে বলা যায়। অন্যদিকে অতিথি বক্তাদের মধ্যে যাঁরা ৭০ শতাংশের নীচে ফলপ্রসূতা অর্জন করেছেন তাঁদেরকে পরবর্তী পাঠ্যক্রমে আমন্ত্রণ জানানো মোটেই বাঞ্ছনীয় হবে না।

৪.৬. শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন ব্যবস্থাপনা ও সময়সূচীঃ শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সকালে ডাইনিং হলে প্রবেশের শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭·৫০ মিঃ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নিয়মটি অনুসৃত হওয়ার ফলে শ্রেণীকক্ষে সঠিক সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সামান্যতম শিথিলতার সুযোগ প্রশিক্ষণার্থীদের বিলম্বে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য দায়ী। এ বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রশাসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে বেশ কিছু যৌথ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। সাধারণতঃ অতিথি বক্তারা এই অধিবেশনগুলো পরিচালনা করে থাকেন। একটি বিশাল দলকে শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতার মাধ্যমে ধরে রাখার জন্য শুধুমাত্র বক্তার ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। পাঠ্যক্রম প্রশাসনেরও এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে। যৌথ অধিবেশনে বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপী আলোচনা আগ্রহ ও ধৈর্য্যের সংগে শ্রবণ করানোর শিক্ষা দেওয়াও এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। পাঠ্যক্রম প্রশাসনকেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়। তবে যৌথ অধিবেশনগুলো সর্বাধিক ফলপ্রসু করবার জন্য অতিথি বক্তা নির্বাচনে সতর্কতা, সঠিক সময়ে অধিবেশন শুরু ও শেষ, হ্যান্ডআউট প্রদানের ব্যবস্থা, মাইক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে সর্বাধিক প্রয়াস অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা যায়। একই সাথে বিশেষ ব্যক্তি বা ক্ষেত্র ছাড়া যৌথ অধিবেশন যথা সম্ভব কম আয়োজনের সুপারিশ করা যায়।

শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে একটি উন্নয়ণশীল দেশের প্রেক্ষাপটে তা পর্যাপ্ত। সেজন্য এই সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যক্রম চলাকালীন সময়ে ইলেকট্রিক ফ্যান বা এয়ারকুলার বিকল হয়ে পড়লে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা মেরামত করা প্রয়োজন। লেকচার থিয়েটারে প্রত্যেকটি ইলেকট্রিক ফ্যানের সুইচ আলাদা আলাদা হওয়া দরকার। প্রশিক্ষণার্থীদের আসন বন্টন ব্যবস্থা এমনভাবে করা উচিত যাতে করে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী অন্ততঃ একবার পাঠ্যক্রমে প্রথম সারিতে বসার সুযোগ পান। চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের দৈনন্দিন পরিবীক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সুপারিশের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে অনুষদ সভায় সকাল ৮ ঘটিকা থেকে দুপুর ২.টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৫টি অধিবেশন সমাপ্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। অনুষদসভায় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ায় মধ্যাহ্ন ভোজের আগে সকল তাত্ত্বিক অধিবেশন সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণাথীরা একদিকে যেমন মধ্যাহ্ন ভোজ উত্তর ক্লান্তি থেকে রেহাই পাবেন অন্যদিকে বৈকালিক খেলাধুলার সময়ও বৃদ্ধি পাবে।

৪.৭. বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকান্ডঃ বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও অতাত্ত্বিক পাঠ্যসুচীর বাইরে প্রশিক্ষণার্থীরা নানা ধরণের সৃজনশীল কর্মকান্ডে তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকেন। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিতা সন্ধ্যা, রক্তদান কর্মসুচী, চিত্রকলা প্রদর্শনী, দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ, স্মরনিকা প্রকাশ, ইত্যাদি নানা ধরণের কর্মসুচী বাস্তবায়ণ করেছেন। পুর্ববর্তী

পাঠ্যক্রম সমুহের সংযোজিত নুতন বিষয়সমূহ যেগুলো পরবর্তীতে প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় সেগুলো পরবর্তী পাঠ্যক্রম সমূহে বহাল রাখা যেতে পারে। যেমন ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব,স্যুট/শাফারী পরিধান করে শ্রেণীকক্ষে আসা ইত্যাদি বিষয় প্রশংসিত হয়েছে। অবশ্য গরম কালে স্যুট পরিধান করার পরিবর্তে শুধু টাই পরিধান করার রীতি প্রচলন করা যায়।

৪.৮. ডর্মিটরী, ক্যাফেটেরিয়া ও গ্রন্থাগারঃ চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষণার্থীরা পরবর্তী পাঠ্যক্রমসমুহকে আরো ফলপ্রসু করবার জন্য কেন্দ্রের ডর্মিটরী, ক্যাফেটেরিয়া ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ণের জন্য বিভিন্নমুখী প্রস্তাব রেখেছেন। নিম্নে তিনটি সারণীর মাধ্যমে এসকল প্রস্তাব সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। সারণী ৫ এ ১৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ৯০ ভাগ) ডর্মিটরী বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন। বাকী ১৪ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ১০ ভাগ) এ বিষয়ে কোন উত্তর দেননি। সারণী ৬ এ ১৪৬ জন প্রশিক্ষণাথীর মধ্যে ১১৮ জন প্রশিক্ষণাথী (শতকরা ৮১ ভাগ) ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। বাকী ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ১৯ ভাগ) এ বিষয়ে কোন মতামত দেননি। সারণী–৭ এ ১৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৯১ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ৬২ ভাগ) গ্রন্থাগার বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। বাকী ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী (শতকরা ৩৮ ভাগ) এ বিষয়ে কোন মতামত দেননি। ৫ জনের কমসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী যে বিষয়সমূহ প্রস্তাব করেছেন তা নিম্নের তিনটি সারণীতে দেখানো হয়নি। এখানে এমনও দেখা গেছে যে একই প্রশিক্ষণার্থী একাধিক বিষয় সংযোজনের প্রস্তাব করেছেন। আবার কিছুসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী তেমন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখেননি।

সারণী–৫

ডর্মিটরী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রস্তাব সমূহ

প্রস্তাব সমূহ	প্রস্তাবকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(ক) দুইজনের জন্য একটি বাথরুমের ও একটি টয়লেটের ব্যবস্থা করা	৫০ (৩৮)*
(খ) প্রতিদিন ঝাড়ুদার কর্তৃক রুম ঝাড়ু দেওয়া ও মোছা	৪৮ (৩৬)
(গ) পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	২২ (১৭)
(ঘ) প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে টেবিল ল্যাম্প সরবরাহ করা	২১ (১৬)
(ঙ) মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করা	১৬ (১২)

* বন্ধনীর ভিতর মোট উত্তরদাতার শতকরা ভাগ দেখানো হয়েছে।

সারণী– ৬

ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রস্তাবসমূহ

প্রস্তাবসমূহ	প্রস্তাবকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(ক) রান্নার মান উন্নয়ন করা	২৮ (২৪) *
(খ) খাবারের মান উন্নয়ন করা	২৭(২৩)
(গ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া	২০ (১৭)
(ঘ) বাবুর্চিদের রান্না বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া	৯ (৮)
(ঙ) থালা, বাটি, গ্লাস নিম্নমানের, এগুলোর মান উন্নত করা	৭ (৬)
(চ) হাত মুখ ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বেসিনের ব্যবস্থা	৭ (৬)
(ছ) মহিলাদের আলাদা বসার ব্যবস্থা করা	৭ (৬)

* বন্ধনীর ভিতর মোট উত্তরদাতার শতকরা ভাগ বুঝানো হয়েছে।

সারণী– ৭

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রস্তাব সমূহ

প্রস্তাবসমূহ	প্রস্তাবকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(ক) গ্রন্থাগার শুক্রবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে খোলা রাখার ব্যবস্থা করা	২৩ (২৫) *
(খ) প্রতিদিন রাত্রি ১১টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা রাখা	৯ (১০)
(গ) কঠোর নিয়মে সব ধরণের বই অন্ততঃ ২ দিনের জন্য ইস্যু করা	৯ (১০)
(ঘ) গ্রন্থাগারে সকলের নীরবতা পালনের নিয়ম পালন করতে বাধ্য করা	৭ (৮)
(ঙ) বই খুঁজে দিতে কর্মচারীদের অনীহা প্রকাশ দূর করা।	৬ (৭)

* বন্ধনীর ভিতর মোট উত্তরদাতার শতকরা ভাগ বুঝানো হয়েছে।

ডর্মিটরী কক্ষে স্বল্প পরিসর, বৃষ্টির পানি প্রবেশ, বাথ রুম ও টয়লেট সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণার্থীদের সমস্যা সমাধান করা না গেলেও ডর্মিটরীর সার্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রুম বয় সার্ভিসের উন্নয়ন, মশার উপদ্রব কমানো ইত্যাদি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। একই কক্ষে দুইজন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করায় রাত্রিতে পড়াশুনার সুযোগ প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকলের জন্য একটি করে টেবিল ল্যাম্পের ব্যবস্থা করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীগণ আসার আগেই ট্যাপ, শাওয়ার ইত্যাদি সচল আছে কিনা পরীক্ষা করে রাখা দরকার। ক্যাফেটেরিয়াতে এক সংগে অধিকসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর হাত ধোয়ার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত থাকায় কিছু নুতন বেসিন সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে তার বাস্তবায়নও ঘটেছে। বিনোদনের জন্য ডর্মিটরীতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মাঝে মাঝে ভিসিআর–এ ছবি প্রদর্শন করা হয়। এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য শুধুমাত্র হালকা বিষয়ের ছবি না দেখিয়ে কিছু বিশ্ব বিখ্যাত ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। ডর্মিটরী সংক্রান্ত আরো কিছু প্রস্তাবাবলী পরিশিষ্ট ক তে দেখা যেতে পারে।

৪.৯. পরীক্ষা পদ্ধতিঃ কিছু প্রশিক্ষণার্থীর আপত্তি সত্ত্বেও পরীক্ষা পদ্ধতি সঠিক বলে মনে করা যায়। অন্ততঃ একটি বা একাধিক পরীক্ষা Open Book System এ হতে পারে এবং পরীক্ষার আগে তথাকথিত Suggestion দেয়ার রীতি একেবারে উঠিয়ে দেয়া উচিত। টার্ম পেপার ব্যবস্থাপনা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে এবং এমনিভাবে পূর্বেই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোন প্রশ্নপত্রে Multiple choice প্রশ্ন এবং কোন প্রশ্নপত্রে বিশ্লেষণাত্মক বা মতামতমূলক প্রশ্নের আধিক্যই বেশী। আবার দুটোর সমন্বয়ও দেখা যায়। বস্তুতঃ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে স্মরণশক্তি, যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিভিন্ন নির্ণায়কের মাধ্যমে মেধা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, Multiple choice প্রশ্ন, বিশ্লেষণাত্মক বড় প্রশ্ন সবকিছুর সমাবেশ ঘটিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরী করা যায় কিনা বিবেচনা করা যায়। যেখানে Multiple choice প্রশ্ন প্রণয়ন করা অসুবিধাজনক সেখানে ছোট প্রশ্ন করা যেতে পারে।

৪.১০. পাঠ্যক্রমের সার্বিক কার্যকারিতাঃ প্রতিটি পাঠ্যক্রমই বিশেষ কয়েকটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়। এই উদ্দেশ্যগুলি সর্বাংশে অর্জনের মধ্যেই পাঠ্যক্রমটির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার পাঠ্যক্রমটিকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য বেশ কিছু উপাদান (Inputs) যেমন তাত্ত্বিক বিষয়, অতাত্ত্বিক বিষয়, বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে পরিবেশন করা হয়। সেদিক দিয়ে এই সমস্ত উপাদান সমূহের ফলপ্রসূতার মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমেও পাঠ্যক্রমটির মূল্যায়ন করা সম্ভব। যে কারণে এখন কয়েকটি বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলপ্রসূতার মাত্রা ও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের ফলপ্রসূতার মাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হবে।

সারণী ৮–এ দেখা যাচ্ছে চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলপ্রসূতার সার্বিক গড় মাত্রা মোটামুটি আশাব্যঞ্জক। তবে ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমের চেয়ে এই ফলপ্রসূতার গড় মাত্রা কিছুটা কমেছে। অন্যদিকে সারণী ৯–এ দেখা যাচ্ছে বিষয়ভিত্তিক ফলপ্রসূতার সার্বিক গড় মাত্রা একাদশ বিশেষ বুনিয়াদী থেকে চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে নিম্নগামী হয়েছে। চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে ভূমি ব্যবস্থাপনা, টার্ম পেপার এবং প্রশাসনে নৈতিকতা বিষয়সমূহে ফলপ্রসূতার মাত্রা তেমন প্রত্যাশিত হয়নি। অন্যদিকে চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে শিক্ষা সফর খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। এভাবে পূর্ব থেকে শিক্ষা সফরের কাঠামো নির্মাণ করে বিশাল দলকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দলভিত্তিক উপদেষ্টা নিয়োগ করে এবং সর্বোপরি প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি ও মন্তব্য ইত্যাদি সব কিছুই শিক্ষা সফরকে সাফল্য মন্ডিত করতে সাহায্য করেছে। বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে একটি নতুন সংযোজন পিয়ার উপদেষ্টা নিয়োগ। প্রতিদিন চায়ের টেবিলে পিয়ার উপদেষ্টাদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক প্রশিক্ষণার্থীরই স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। তাই মাঝে মাঝে উপদেষ্টাদের সংগে ছোট ছোট দলে প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনা হওয়া উচিত। প্রতি ১০ (দশ) জনের একটি উপদল গঠন করে প্রত্যেক উপদলের জন্য একজন উপদেষ্টা দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন। দায়িত্ব কাল পুরো পাঠ্যক্রম সময়ের জন্য বহাল থাকতে পারে। উপদেষ্টা তাঁর সময় এবং সুযোগ মত সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন প্রশিক্ষণার্থীদের সংগে মিলিত হতে পারেন এবং ভাব বিনিময় করতেপারেন।

সারণী– ৮

বিভিন্ন বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলপ্রসূতার মাত্রা

উদ্দেশ্যসমূহ		ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)			
		একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	চতুর্দশ
(ক)	সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে সংবিধানিক ও আইনগত ভূমিকা উপলব্ধিকরণ	৭৩	৬৮	৮০	৭৮
(খ)	নির্ধারিত বিষয়সমূহে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করণ	৭৪	৭০	৭৬	৭১
(গ)	বিভিন্ন ক্যাডারের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সদ্ভাব সৃষ্টি করা	৬৮	৭৫	৮০	৮৮
(ঘ)	উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া	৭৬	৭৪	৭৮	৭৫
(ঙ)	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কৌশলের ব্যবহারিক দিকগুলির সাথে অংশগ্রহণকারীদের সুষ্ঠুভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া	৬৯	৬৪	৭১	৭০
(চ)	কঠোর শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণ কারীদের নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আবিস্কারে উদ্বুদ্ধ করা	৭৩	৭৪	৮১	৬৯
(ছ)	ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী ও নিয়মশৃংখলা মেনে চলার মানসিকতা সৃষ্টি করা	৭৭	৭৬	৮৩	৭৮
(জ)	অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত মনোভাব গঠনে সহায়তা করা	৭১	৭১	৭৫	৬৮
(ঝ)	ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যক্রম বর্হির্ভূত বিষয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা	৬৩	৬৭	৭৩	৭১
	সার্বিক গড় (%)	৭২	৭১	৭৭	৭৪

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের ১৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী (মোট প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা ৯২ ভাগ) পাঠ্যক্রমটির যে সমস্ত সবল দিক চিহ্নিত করেছেন তার উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ সারণী–১০ এ সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। ১০ নং সারণীতে দেখা যায় বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখিত পাঠ্যক্রমটি যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। সারণী–৮ লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে, আন্তঃক্যাডার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখিত পাঠ্যক্রমটি সর্বাধিক (৮৮%) ফলপ্রসূতা অর্জন করেছে। তাছাড়া নিয়ম শৃংখলা, জনসমক্ষে কথা বলা, খেলাধূলা, উন্নয়ন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ চতুর্দশ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে সবল দিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। পাঠ্যক্রমটির সার্বিক কার্যকারিতা নির্ধারণ এর ক্ষেত্রে এ বিষয়সমূহ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

সারণী—৯

বিভিন্ন বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের বিষয় ভিত্তিক ফলপ্রসূতার মাত্রা

বিষয়সমূহ		প্রলপ্রসূতার মাত্রা (%)			
		একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	চতুর্দশ
(ক)	বাংলাদেশ চর্চা	৭২	৭২	৭৪	৭২
(খ)	লোকপ্রশাসন	৮০	৭৫	৮০	৭৬
(গ)	উন্নয়ণ অর্থনীতি	৭৭	৭১	৭৯	৭১
(ঘ)	অফিস ব্যবস্থাপনা	৭৩	৭২	৮০	৭৭
(ঙ)	কর্মী ব্যবস্থাপনা	৭১	৭০	৭৫	৭৪
(চ)	ভূমি ব্যবস্থাপনা	–	–	–	৬৯
(ছ)	টার্ম পেপার	৭৫	৭০	৭০	৬৩
(জ)	সভা পরিচালনা	৭৭	৮০	৭৩	৭৪
(ঝ)	মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রম	৮৪	৮৮	৮৪	৮১
(ঞ)	শিক্ষা সফর	৬৭	৬৭	৬৩	৭২
(ট)	রাষ্ট্রীয় কার্যে সুশীল সেবকের ভূমিকা	৭৬	৭০	৬৩	৭১
(ঠ)	প্রশাসনে নৈতিকতা	৭৭	৭৩	৬৫	৬৭
(ড)	গবেষণাপ্রতিবেদনপ্রণয়ন	৭৫	৭৫	৭৪	৬৯
	সার্বিক গড় (%)	৭৫	৭৪	৭৩	৭২

সারণী—১০

সার্বিকভাবে পাঠ্যক্রমের সবল দিক সমূহ

সবল দিকসমূহ	সবল দিক উত্থাপন কারীদের সংখ্যা
(ক) বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন	২৮ (২১)*
(খ) সময়ানুবর্তীতা ও নিয়ম শৃংখলা	২৮ (২১)
(গ) জনসমক্ষে কথা বলার অভ্যাস গঠন	১৭ (১৩)
(ঘ) শরীর চর্চা ও খেলাধূলা	১৬ (১২)
(ঙ) প্রশাসনিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন	১৪ (১০)
(চ) উন্নয়ণ অর্থনীতির আলোচনা	১৩ (৯)
(ছ) শিক্ষা সফর	৬ (৪)

* বন্ধনীর ভিতর মোট উত্তরদাতা শতকরা ভাগ বুঝানো হয়েছে।

৫. সুপারিশ সমূহঃ

(১) প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার জন্য "নবীনের মুখোমুখি প্রবীন" শীর্ষক ২ ঘন্টাব্যাপী একটি সম্প্রসারণ অধিবেশনের আয়োজন করা যেতে পারে। এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৪ অথবা ৫ জন দেশের প্রখ্যাত প্রবীন প্রশাসক, নীতি প্রণেতা, সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ ও আইন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

(২) "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য" বিষয়ে একটি অধিবেশন বাংলাদেশ চর্চা বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। খনিজ সম্পদ বিষয়টিকে বন সম্পদের সংগে সংযোজিত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের এই সমস্ত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তোলার প্রয়াস নেওয়া যায়।

(৩) একটি বিশাল দলকে প্রতিটি কার্যক্রমে সুকঠিন নিয়মশৃংখলার মধ্যে বেঁধে রাখার জন্য পাঠ্যক্রম প্রশাসনের যোগাযোগ প্রক্রিয়াকেও সুকঠিন রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখা দরকার।

(৪) বুনিয়াদী প্রতিটি পাঠ্যক্রমেই সাঁতার শিক্ষা কার্যক্রম থাকাপ্রয়োজন। অন্ততঃ যাঁরা সাঁতার জানেন না তাঁদেরকে সাঁতার শেখানোর একটি প্রয়াস নেওয়া যায়।

(৫) বিগত কয়েকটি পাঠ্যক্রম থেকেই প্রশিক্ষণার্থীরা অধিকতর ইনডোর খেলার বন্দোবস্ত করার দাবী জানিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দাবী অনুসারেই জাতীয় পর্যায়ের এমন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি জিমনিসিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

(৬) মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রমে অনুষদ সদস্যদের মধ্য থেকে দু'জন বিচারককে যদি একই অধিবেশনের জন্য কোন সংগত কারণে পাওয়া না যায় শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই আগের মত একজন বিচারকের নীতিমালা অনুসরণ করা যায়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। মূল্যায়নের মানদন্ড সুষম করার জন্য বিচারকদের নিয়ে মূল্যায়ন অনুবিভাগ একটি ব্রিফিং অধিবেশনের আয়োজন করতে পারে।

(৭) যৌথ অধিবেশগুলো সর্বাধিক ফলপ্রসূ করার জন্য অতিথি বক্তা নির্বাচনে সতর্কতা, সঠিক সময়ে অধিবেশন শুরু ও শেষ, হ্যান্ড আউট প্রদানের ব্যবস্থা, মাইক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে সর্বাধিক প্রয়াস অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা যায়। সেই সংগে বিশেষ ব্যক্তি বা ক্ষেত্র ছাড়া যৌথ অধিবেশন না করারও সুপারিশ করা যায়।

(৮) লেকচার থিয়েটারে প্রত্যেকটি ইলেকট্রিক ফ্যানের সুইচ আলাদা আলাদা হওয়া দরকার। প্রশিক্ষনার্থীদের আসন বন্টন ব্যবস্থা এমনভাবে করা উচিত যাতে করে সকল প্রশিক্ষার্থী অন্ততঃ একবার প্যঠ্যক্রমে প্রথম সারিতে বসার সুযোগ পান।

(৯) পূর্ববর্তী পাঠ্যক্রম সমূহের নুতন বিষয়সমূহ যেগুলো পরবর্তীতে প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় সেগুলো পরবর্তী পাঠ্যক্রম সমূহে বহাল রাখা যায়। যেমন ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব, স্যুট/সাফারী পরিধান করে শ্রেণীকক্ষে আসা ইত্যাদি বিষয় প্রশংসিতহয়েছে।

(১০) নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের উপর যেমন কঠোরতা আরোপ করা হয় নির্দিষ্ট সময়ে অধিবশেন শুরু ও শেষ করার ব্যাপারে অনুষদদেরও তেমনি দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন।

(১১) ডর্মিটরীতে একই কক্ষে দু'জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করায় রাত্রিতে পড়াশুনার সুযোগ প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বৃদ্ধি জন্য একটি করে টেবিল ল্যাম্প এর বন্দোবস্ত করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীদের আসার আগেই ডরমিটরীতে ট্যাপ, শাওয়ার ইত্যাদি সচল আছে কিনা পরীক্ষা করে রাখা দরকার।

(১২) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, Multiple choice প্রশ্ন কিংবা বিশ্লেষণাত্মক বড় প্রশ্ন সব কিছুর সমাবেশ ঘটিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরী করা যায় কিনা বিবেচনা করা যায়।

(১৩) মাঝে মাঝে পিয়ার উপদেষ্টাদের সংগে ছোট ছোট দলে প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনা হওয়া উচিত। সেজন্য প্রতি ১০ জনের একটি দল গঠন করে প্রত্যেক দলের জন্য অনুষদ থেকে একজন উপদেষ্টাকে পুরো পাঠ্যক্রম সময়ের জন্য তাঁদের সংগে সংযুক্ত করা যায়। উপদেষ্টা তাঁর সময় ও সুযোগ মত সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন প্রশিক্ষণার্থীদের সংগে মিলিত হতে পারেন।

৬. *উপসংহার ঃ*

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি মৌল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের ভবিষ্যত বিশেষ কর্মক্ষেত্রের উপর প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান দানের জন্য এই পাঠ্যক্রমটি প্রণয়ন করা হয়েছে। দীর্ঘ কর্মজীবনের শুরুতে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নবীন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিত্ব তৈরীর একটি প্রয়াস। যদিও কেন্দ্র পরিচালিত বিভিন্ন বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে শুধু যে নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরই প্রেরণ করা হয় এমন নয়। ৫ থেকে ১০/১২ বৎসর পর্যন্ত চাকুরী হয়েছে অথচ চাকুরীতে স্থায়ীকরণ করা হয়নি এমন অনেক কর্মকর্তাকেই কেন্দ্র ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ৮টি ৪ মাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ১৪টি ২ মাসের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দুটি বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম ৪০ উর্ধ্ব বয়েসীদের জন্য প্রণীত হলেও পরবর্তীতে অপ্রশিক্ষণের জের (ব্যাকলগ) সমস্যার সমাধানে এই দুই মাসের পাঠ্যক্রমটি সকলের জন্য পরিচালিত হতে থাকে। বর্তমানে জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপিএটিসিসহ মোট ১১টি প্রতিষ্ঠানে এই বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসাবে নিজ দায়িত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা এবং আগামী কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটানো এবং জনস্বার্থে রাষ্ট্রের নীতি বাস্তবায়ন করা এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের মূল দর্শন। এই মূল দর্শনকে সামনে রেখে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে কিছু বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা ও সুপারিশ নিয়ে এই প্রতিবেদন।

পরিশিষ্ট—ক

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের মৌখিক মূল্যায়নে নির্ধারিত প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতামতের সারাংশঃ

বাংলাদেশ চর্চা অবয়বঃ–

– টার্ম পেপার এর মূল্যায়ন পদ্ধতিতে একজন কর্মকর্তার পক্ষে মূল্যায়ন করা ঠিক বলে মনে হয় না। একাধিক অনুষদ সদস্য দ্বারা এই বিষয়টি মূল্যায়িত হওয়া উচিত।

লোক প্রশাসন অবয়বঃ

– সুশীল সেবকের ভূমিকা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালনা না করে এক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালনা করা ভাল।

– মডিউল ইন–চার্জ এর একাধিক ক্লাশ থাকা উচিত।

উন্নয়ন অর্থনীতি অবয়বঃ

– একটি উপ–অবয়বের সমস্ত অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার সংগে সংগেই উক্ত উপ–অবয়ব এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

– বর্তমান ও অতীত এর উন্নয়ন অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা হওয়া উচিত।

মৌখিক উপস্থাপনা, পরীক্ষা পদ্ধতিও শিক্ষা সফরঃ

–মৌখিক উপস্থাপনায় সভাপতির মূল্যায়নের মানদন্ড সুষম নয়।

– কেন্দ্রে যে সমস্ত যোগ্য অনুষদ আছেন শুধু তাদেরকেই মৌখিক উপস্থাপনায় সভাপতি নির্বাচন করা উচিত।

– পরীক্ষা পদ্ধতি সেই সনাতন পদ্ধতিতে চলে আসছে। তাই পরীক্ষা পদ্ধতি একটু ভিন্নতর ভাবে হওয়া উচিত কেননা মুখস্ত শক্তি প্রশিক্ষণার্থীদের নেই।

– শিক্ষা সফরে যাওয়ার ব্যাপারে কে কোথায় যাবে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত।

প্রত্যুষ শরীর চর্চা, বৈকালিক খেলাধূলা ও চিকিৎসা সুবিধাঃ

– খেলাধূলার বিষয়ে কোন দল কি খেলা করবে তা আগেই নির্ধারণ করা ভাল।

– বৈকালিক খেলাধলার সময় কম ছিল।

– প্রাথমিক চিকিৎসার আরো অধিবেশন থাকা দরকার।

ডরমিটরী, ক্যাফেটারিয়া ও লাইব্রেরীঃ

– টিভি রুম, গেষ্ট রুম আলাদা হওয়া উচিত।

– গেষ্ট রুমে খবরের কাগজ সরবরাহ করা উচিত।

– পোকা–মাকড়, মশা মাছি দূর করার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

– টেলিফোন চার্জ কমানো উচিত।

– ঝাড়ুদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

– ডর্মিটরীতে নামাজের ঘর দরকার।

পাঠ্যক্রম প্রশাসনঃ

– মৌখিক মূল্যায়ন অধিবেশনে সকল ক্যাডারের সদস্যদের বক্তব্য প্রদানের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

– পাঠ্যক্রম প্রশাসন অনেক সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব করেছেন।

– উপরের শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ যেভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের সংগে মিথস্ক্রিয়ায় মিলিত হবার কথা ছিল, তা তাঁরা করেন নি বলে প্রশিক্ষানার্থীদের খারাপ লেগেছে।

– উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়া উচিত ছিল।

তথ্য নির্দেশিকা

১. A. C. Hamblin "Evaluation of Training", Industrial Training International, November 1970, PP. 33-36

২· কাজী হাসান ইমাম "ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন, লোক প্রশাসন সাময়িকী, ি্তীয় সংখ্যা,এপ্রিল–১৯৯১।

৩· গৌর সুন্দর বনিক "অষ্টম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন" বিপিএ টিসি, মিমিও।

৪· সুপদ কুমার ঘোষ "নবম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন", বিপিএটিসি, মিমিও।

৫· গৌর সুন্দর বনিক ও সুপদ কুমার ঘোষ "দশম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন" বিপিএটিসি, মিমিও।

৬· গৌর সুন্দর বনিক "দ্বাদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন" বিপিএটিসি, মিমিও।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সদ্য সমাপ্ত গবেষণা কর্মের তালিকা

১. A Study of Regional Public Administration Training Centres (RPATC) project, (1988-89).

২. দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মূল্যায়ন (১৯৮৮-৮৯)

৩. দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯)

৪. On the Job Training Needs Assessment of Class II Level Officers. (1988-89).

৫. বেঞ্চ ক্লার্কদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯).

৬. Performance Appraisal System for Class III Employees in Bangladesh (1988-89).

৭. Evaluation System of Training Programmes for Class III and Class IV Employees: A Study, (1988-89).

৮ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯)

৯. Assessment of Training Needs of Class III Employees, (1988-89).

১০· চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯)

১১. Training Needs Identification for Training of Trainers- TOT, (1988-89).

১২· বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগ নীতি (১৯৮৯-৮৯)

১৩· প্রশাসনে মানবিক সম্পর্ক (১৯৮৯-৯০)

১৪· Upazila System & Agricultural Development in Bangladesh: A Case study of Selected Upazila (1989-90).

১৫. Upazila System & Poverty Alleviation (1989-90).

লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষে প্রকাশনা কর্মকর্তা মোঃ ইমামুল হক কর্তৃক সাভার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ভূঁইয়া গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ১৯২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।